ওঁ

- ভক্তি উপহার -

এ সময় যে প্রাচীন ব্রাহ্মণপরিবারের
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংশ্লিষ্ট
সেই হতভাগ্য, দুঃস্থ; প্রাচীন ব্রাহ্মণ-
পরিবারের (আমার পিতৃদেব কর্তৃক
সঙ্কলিত) ক্ষুদ্র ইতিহাস বিশ্বভারতীর
সাদরে আদৃত হইবে আশা করিয়া -
বিশ্বভারতীর প্রাণমুগ্ধ, গুরুদেবের ভক্ত
শিষ্য; নিত্যবিষয়, স্নেহভিক্ষু বিমলেন্দু
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বিশ্বভারতী
পুস্তকালয়ে ভক্তি উপহার প্রদত্ত হইল।

স্নেহ ভিক্ষু -
শ্রী বিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মৈছাল পোঃ + গ্রাম
২৪ পরগণা

২৯শে ভাদ্র
১৩২৭
শান্তিনিকেতন =

মলুটী-রাজবংশ

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সঙ্কলিত

প্রকাশক

শ্রীশরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়

মলুটী, সাঁওতাল পরগণা।

সন ১৩২৮

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রিয়তম

৺সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও

৺গোপালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রিয় সুবোধ, মানুষ জন্মিলেই মরিবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও তাহারা প্রিয়জনের অকাল-বিয়োগ সহ্য করিতে পারে না। অভাগিনী বিধবার বিষাদ-ময়ী মূর্ত্তি যখনই দেখি, তখনই প্রাণের ভিতর কি এক অব্যক্ত যাতনা উপস্থিত হইয়া দেহ অবসন্ন করিয়া ফেলে। তুমি আমাদের সংসারে যে অশান্তির আগুণ জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহা নিভিবে না। অথবা মানুষ বুঝি পাষাণ, তাহার দেহে সবই সহ্য হয়!

প্রাণের স্ফটিক, অপরূপ রূপ, অমায়িক স্বভাব ও স্বর্গের হৃদয় লইয়া দুই দিনের জন্য সংসারে আসিয়াছিলে। শাপ-ভ্রষ্ট দেব-শিশু তুমি, তাই হতভাগ্য পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বুকে শেল দিয়া অকালে চলিয়া গিয়াছ। কি সুনয়নে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, যে, আজও তোমার কথা মনে হইলেই প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, দেহ কণ্টকিত হয়। তোমার মোহিনী মূর্ত্তি এখনও চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।

তোমাদের দুই জনের কোন প্রকারে স্মৃতি রক্ষা করিব, ইহাই আমার অন্তরের কামনা। অর্থাভাবে সে সাধ অপূর্ণ রহিয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক দেশের সর্ব্বত্র আদৃত হইবে না, তাহা জানি; কিন্তু মলুটীর বিশাল পরিবারে ইহা সমাদরে রক্ষিত হইবে। এই হেতু "মলুটী-রাজবংশ" তোমাদের পবিত্র মধুময় নামে উৎসর্গ করিয়া বিপুল আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছি।

মলুটী
১০ই মাঘ, ১৩২৮

তোমাদের বিয়োগ-কাতর
শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মলুটী-রাজবংশ।

রাজা বাজবসন্ত

ই, আই, রেলওয়ের রামপুরহাট ষ্টেশনের সাত মাইল পশ্চিমে মলুটী গ্রাম অবস্থিত। কিছুকাল পূর্ব্বে এই জনবহুল পল্লী বীরভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে সাঁওতাল পরগণার অধীনে আসিয়াছে। মলুটীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রামখানিকে বেষ্টন করিয়া তিন দিকে পর্ব্বতপ্রসূতা ক্রীড়াময়ী স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। কেবলমাত্র পশ্চিমভাগে নদী নাই, এই দিকে গ্রামের অনতিদূরে বন-জঙ্গল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। গ্রাম-প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যাকালে পাহাড়ের কোলে অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিলে অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। দেওঘর, মধুপুর প্রভৃতির ন্যায় মলুটী স্বাস্থ্যকর স্থান, এখনও এখানে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় না। গ্রামের অধিবাসিগণের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ এবং এই সকল ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই

একবংশীয়। ব্রাহ্মণেরাই এখানকার জমিদার এবং ইঁহারাই মলুটীর রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। এই প্রাচীন রাজ-বংশীয়দিগের মলুটীতে তিনশত বৎসর কাল ব্যাপিয়া বসবাস চলিয়া আসিতেছে। এক সময়ে এই প্রাচীন রাজপরিবার বিষয়-বিভবে, শক্তি-সামর্থ্যে ও কীর্ত্তি-কলাপে এ প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু চিরদিন কাহারও প্রভাব-প্রতিপত্তি, ধন-সম্পদ্ বা সুপ্রসন্নভাগ্য সমভাবে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় স্থায়িত্ব লাভ করে না। বিধাতার এই বিচিত্র বিধানের অধীনে মলুটীর রাজপরিবারও বংশবৃদ্ধি-সহকারে ক্রমশঃ বিষয়-বিভবে হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছেন। অগ্রে পাঠকবর্গকে রাজপরিবারের কৌতূহলপূর্ণ প্রাথমিক অভ্যুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত করিয়া যথাস্থানে অপরাপর বৃত্তান্ত শুনাইব।

বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মলুটী-রাজবংশের আদিপুরুষ। অষ্টম বর্ষ বয়সে বসন্ত পিতৃহীন হয়েন। বসন্তের পিতা দরিদ্র ছিলেন, শ্রমলব্ধ যৎসামান্য অর্থে কায়ক্লেশে তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। স্বামি-বিয়োগে বসন্ত-জননী পুত্রের ভরণ-পোষণের ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ করিবেন, এই চিন্তায় নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। বীরভূম জেলার মৌরেশ্বর থানার অধীন কাটীগ্রাম-নামক পল্লীতে বসন্তের পিতা বাস করিতেন এবং এই পল্লীতেই বসন্ত জন্মগ্রহণ করেন। বসন্ত-জননী জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর

না দেখিয়া গ্রামের জনৈক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে পাচিকার কার্য্য গ্রহণ করিলেন। বালক বসন্ত ব্রাহ্মণের গোচারণে নিয়োজিত হইল। কিছুকাল পরে একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রখর সূর্য্যকিরণ অসহ্য হওয়ায় বসন্ত গো সকল এক আম্রকাননের ছায়াশীতল স্থানে একত্র করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের জন্য স্বয়ং একটী আম্রবৃক্ষের তলে মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িলেন। অল্পক্ষণেই বালকের রৌদ্রক্লিষ্ট শ্রমক্লান্ত দেহে ঘোর নিদ্রা আসিয়া পড়িল। রাজপথের সন্নিধানেই আম্রকানন, ঠিক এই সময়ে সেই পথ দিয়া জনৈক দণ্ড-কমণ্ডলু-ধারী গৈরিকবসন-পরিহিত ব্রহ্মচারী গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন। ব্রহ্মচারী দেখিলেন, বৃক্ষতলে দশম বর্ষীয় বালক ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, বালকের মুখমণ্ডলে বৃক্ষান্তরাল হইতে সূর্য্য-কিরণ পতিত হইতেছে, এক বৃহৎ বিষধর সর্প তাহার বিশাল ফণা বিস্তার করিয়া নিদ্রিত বালকের মুখমণ্ডলে পতিত সূর্য্যোত্তাপ নিবারণ করিতেছে। ব্রহ্মচারী এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন এবং অব্যবহিত পরেই বালকের দিকে ধীরপাদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীকে বালকের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া সর্প ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিল। ব্রহ্মচারী বালকের আপাদমস্তক তীব্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ

করিতে লাগিলেন এবং নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন। ব্রহ্মচারী দেখিলেন, বালকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রাজচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং বুঝিলেন, অচিরে এই সর্ব্ব-সুলক্ষণাক্রান্ত বালক রাজত্ব লাভ করিবে। কালবিলম্ব না করিয়া ব্রহ্মচারী বালকের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং পুনঃ পুনঃ বিবিধ প্রশ্নে বালকের সকল অবস্থার কথা জ্ঞাত হইলেন। অনন্তর তিনি বসন্তকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণগৃহে বালকের জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তৎকালে নবম বর্ষেই ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়ন এবং দীক্ষা হইবার প্রথা ছিল। বসন্তেরও যথাসময়ে উপনয়ন এবং দীক্ষা হইয়াছিল। বসন্ত কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, ব্রহ্মচারী তাহা অবগত হইলেন এবং বসন্ত-জননীকে বলিলেন, তোমার এই পুত্র রাজলক্ষণাক্রান্ত; উপযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে এই বালক সপ্তাহ-মধ্যে রাজত্ব লাভ করিবে। যে মন্ত্রে বালক দীক্ষিত হইয়াছে, তাহা তাহার উপযোগী নহে এবং সে মন্ত্র, বিধি-সম্মত বিচার না করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে।

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত সন্তানের এইরূপ ভাবী সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া কোন্ জননী স্থির থাকিতে পারেন? বসন্ত-জননী ব্রহ্মচারীর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিলেন এবং সন্তানের মঙ্গলহেতু যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য ব্রহ্মচারীর চরণে ধরিয়া বার বার কাতর প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, বসন্তের গুরুদত্ত মন্ত্র আমি বিল্ব-পত্রে লিখিয়া দিতেছি এবং এইক্ষণেই বসন্ত তাহা সরোবর-সলিলে বিসর্জ্জন করিয়া আসুন। অবিলম্বে ব্রহ্মচারীর আদেশ প্রতিপালিত হইল। তৎপরে ব্রহ্মচারী শাস্ত্রীয় বিধানে বসন্তকে উপযুক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ভগবানের নিকট বসন্তের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকামনা করিয়া শুভাশীর্ব্বাদ করিলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময়ে বসন্তের গুরুদেব তথায় উপনীত হইলেন; তিনি সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বসন্তকে অভিশপ্ত করিলেন। বলিলেন;—তুমি অল্পায়ু হইবে এবং এইরূপ কুলগুরুর অবমাননা করার পাপে অল্পদিনের মধ্যেই অকালে কাল-কবলিত হইবে। ব্রহ্মচারী ক্রোধোন্মত্ত গুরুর ভীষণ অভিশাপের কথা শুনিয়া বলিলেন, হাঁ, তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবে না, তবে আমার বরে বসন্ত বংশরক্ষা করিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিবেন। ব্রহ্মচারী ও গুরু স্ব স্ব গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। বসন্তের আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মচারীর ইঙ্গিতে এই সকল ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেওয়া হইল না।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময় পাঠানদিগের রাজত্বকাল। খিলিজি-বংশীয় আলাউদ্দিন তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন দেশভ্রমণে ও বিপ্লববাদী রাজন্যবর্গের উচ্ছেদ-

সাধনে বহির্গত হয়েন এবং পথিমধ্যে মৌরেশ্বরের সন্নিকটে ময়ুরাক্ষীনদীতটে বিশ্রামহেতু দিন-কয়েকের জন্য শিবির স্থাপন করেন। সম্রাটের একটী অতি প্রিয় "বাজ"-পক্ষী ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে সম্রাট্ তাঁহার প্রিয় বাজ-পক্ষীকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া সোহাগভরে তাহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিয়া আদর করিতে ছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সোহাগ আদর মানবের পক্ষে দুর্ল্লভ হইলেও বনচারী বিহঙ্গমের মুক্তবায়ুতে স্বাধীনতাভোগের সুখই সমধিক বাঞ্ছনীয়। সুযোগ পাইয়া বাজ সম্রাট্কে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বহু চেষ্টাযত্নেও সম্রাট্ তাহাকে ধৃত-করণে সমর্থ হইলেন না। বাজের পলায়নে সম্রাট্ অতিমাত্র বিহ্বল ও কাতর হইয়া পড়িলেন এবং পারিষদ্বর্গকে আদেশ করিলেন, অবিলম্বে তোমরা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দাও, যে ব্যক্তি আমার বাজ-পক্ষী আনিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে আশাতীত পুরস্কারে পুরস্কৃত করিব। পরদিন প্রভাতে রাজকীয় ঘোষণা গ্রামে গ্রামে ঘোষিত হইল।

এদিকে বসন্তকুমার সন্ধ্যাকালে গো সকল লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইতেছেন—এইরূপ সময়ে, তাঁহার হস্তে একটী পক্ষী আসিয়া বসিল। পক্ষীর অপরূপ সৌন্দর্য্য ও কণ্ঠে স্বর্ণ-শৃঙ্খল দেখিয়া বসন্ত পক্ষীকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং গৃহে আনিয়া যত্ন-সহকারে রক্ষা করিলেন। রাত্রি প্রভাতে

বসন্তের পক্ষি-প্রাপ্তির কথা গ্রামে প্রচারিত হইল, কিন্তু তিনি তখনও ঘোষণাবাণীর কিছুমাত্র অবগত হয়েন নাই। বসন্তের এক দূরসম্পর্কীয় গ্রামবাসী মাতুল যুগবৎ উভয় সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বসন্তের নিকটে আগমন করিলেন এবং অর্থপ্রলোভনে লুব্ধ করিয়া পক্ষীটী হস্তগত করিবার প্রয়াস পাইলেন। মানুষের প্রতি যখন সৌভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্না হয়েন, তখন কোন প্রকার বিপদ-আপদ বা আকস্মিক দুর্ঘটনা-বিশেষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। মাতুলের প্রলোভনে বসন্ত প্রতারিত হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া মাতুল বসন্তকে সকল সংবাদ জ্ঞাত করিলেন এবং সহচর-রূপে বসন্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলে, কিছু অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাবোধে বসন্তকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট্-শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহারা শিবিরে পঁহুছিবামাত্র দ্বাররক্ষক প্রহরিগণ এই আনন্দের সংবাদ অবিলম্বে সম্রাটের কর্ণগোচর করিল এবং সম্রাটের আদেশে বাজপক্ষিসহ বালক বসন্তকে বাদসাহ-সকাশে লইয়া গেল। বাজ পাইয়া সম্রাট্ অতিমাত্র প্রীতি লাভ করিলেন এবং আনন্দভরে কর্ম্মচারিবর্গকে আদেশ করিলেন, এই বালক আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ে অশ্বারোহণে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে যে পরিমাণ স্থান ভ্রমণ করিয়া শিবিরে পুনরাগত হইবে, সেই পরিমাণ স্থানের নিষ্কররূপে অধিকারিত্ব লাভ

করিবে। পরদিন প্রভাতে তাহাই হইল। বসন্ত সূর্য্যোদয় হইবামাত্র অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন এবং সমুদায় দিন অনাহারে অবিশ্রামে দ্রুতগতিতে অশ্বচালনা করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পর দিন যথাকালে দরবার বসিলে কর্ম্মচারিগণ বসন্তকে প্রদক্ষিত ভূমির নিষ্কর ছাড়পত্র লিখিয়া দিলেন এবং স্বয়ং গিয়া সম্রাটের স্বাক্ষর করাইয়া লইবার জন্য বসন্তের হস্তে দলিলখানি সমর্পণ করিলেন। সম্রাট্ তখন আহার করিতে বসিয়াছিলেন, বসন্তের সে সময়ে অবারিত দ্বার ; বালক বসন্ত আহারের স্থানেই দলিল লইয়া উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ও বালককে অপেক্ষা করিতে না বলিয়া এবং লিখিবার উপকরণাদি আনয়নের আদেশ না করিয়া দলিলখানি গ্রহণ করিলেন এবং দলিলের উপর তাঁহার উচ্ছিষ্ট হস্তের ছাপ মারিয়া তাহা বসন্তের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। কেবলমাত্র এই বিস্তীর্ণ ভূমির অধিকারী করিয়া সম্রাট্ ক্ষান্ত হইলেন না, বসন্তকে তিনি রাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া 'রাজা বাজবসন্ত' নামে অভিহিত করিলেন এবং বাসগৃহ নির্ম্মাণজন্য প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা একজন সুদক্ষ ভাস্কর, ভ্রমণের সেই অশ্ব ও কিছু সৈন্যসহ একজন "দলুই"-জাতীয় বাঙ্গালী সৈন্যাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। কি অচিন্তনীয় অপূর্ব্ব ভাগ্য পরিবর্ত্তন! একদিন পূর্ব্বে যাঁহার

জননী হীনবৃত্তিধারিণী পাচিকা ছিলেন, স্বয়ং যিনি জীর্ণ-শীর্ণ মলিন বসন পরিধান করিয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া মাঠে মাঠে গোচারণা করিতেছিলেন, যাঁহার অন্তঃকরণে এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা স্বপ্নে বা কল্পনায় আইসে নাই, আজ তিনি রাজ্যেশ্বর রাজা, এখনই তাঁহার সন্তোষ-সাধন-হেতু দাস-দাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিবে, বলশালী সৈন্যগণ দেহ-রক্ষাহেতু পার্শ্বে, অগ্রে ও পশ্চাতে ধাবমান হইবে, কুটীর-বাসের ছিন্নকন্থা-বিরচিত শয্যার পরিবর্ত্তে সুধাধবলিত মনোরম অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যাচ্ছাদিত পর্য্যঙ্কোপরি শয়নের ব্যবস্থা হইবে। অনন্তশক্তিশালী বিশ্ব-বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্রের এই অননুভূত অভিনয়-লীলা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানব আমরা, এ সকল গূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ।

সম্রাট্-শিবির হইতে বসন্ত দ্রুতগমনে জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে জননীর পদরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া সকল বিবরণ আদ্যোপান্ত জ্ঞাত করিলেন। বসন্ত-জননীর আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার দুই চক্ষুতে প্রীতির অশ্রু নির্ঝরের ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। দৈববলে নগণ্য গোরক্ষকের জননী আজ রাজমাতা হইলেন! পুত্রের মঙ্গলকামনায় অবিলম্বে দেব-মন্দিরসমূহে ষোড়শোপ-

চারে দেব-দেবীর পূজার ব্যবস্থা করিলেন—ব্রাহ্মণগণকে ধন-দান করিলেন এবং দরিদ্রদিগকে ভূরিভোজনে তৃপ্ত করিলেন।

পুত্রের এই সৌভাগ্যোদয় কালেও বসন্ত-জননীর অন্তরে গুরুর অভিশাপের বিভীষিকাময়ী ভীতি প্রতিনিয়ত জাগরূক ছিল। অবিলম্বে তিনি দ্রুত অনুসন্ধানে এক সুন্দরী সদ্বংশ-জাতা পাত্রী স্থির করিয়া মহামহোৎসবে বসন্তের শুভ-পরিণয় শেষ করিলেন। বিবাহের পর বসন্তকুমার আট বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই আট বৎসরে তিনি তাঁহার প্রাপ্ত রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার সুশৃঙ্খলা বিধান করিয়াছিলেন এবং প্রজা-সমূহকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া প্রজাপ্রিয় ভূপতি বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মুখোপাধ্যায় উপাধি ত্যাগ করিয়া রাজ্য-সম্পদের অভিব্যঞ্জক 'রায়' উপাধি ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তদবধি একাল পর্য্যন্ত মলুটী রাজপরিবার 'রায়' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। বসন্তের বয়ঃক্রম যখন সপ্তদশ বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার মাতৃদেবী পরলোক গমন করেন। পুণ্যশীলা সাধ্বীকে পুত্র-শোকে উন্মাদিনী না করিবার জন্যই ভগবান্ তাঁহাকে পুত্রের মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে চরণে স্থান দিলেন। বসন্ত লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে স্বর্গীয়া জননীর আদ্যশ্রাদ্ধে 'দানসাগর' কৃত্য সমাপন করিয়া সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিলেন। এই সময়ে বসন্ত-পত্নী গর্ভধারণ করিলেন এবং যথাকালে এক

আজানুলম্বিতবাহু পরমসুন্দর কুমার প্রসব করিলেন। বসন্তের তখন বয়ঃক্রম আঠার বৎসর। সন্তান ভূমিষ্ঠের পর এক সপ্তাহ মধ্যেই আকস্মিক ব্যাধির আক্রমণে রাজা বাজবসন্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। গুরুর অভিশাপ ও ব্রহ্মচারীর বর ব্যর্থ না হইয়া বর্ণে বর্ণে জ্বলন্তসত্যে পরিণত হইল।

রাজা বাজবসন্তের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী যথা-কালে নবকুমারের অন্নাশন ও নামকরণ শেষ করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। যাবৎ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপযুক্ত না হইলেন, সেকাল পর্য্যন্ত রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য তাঁহার দ্বারাই সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইয়াছিল। রাণী পুত্রকে সোহাগভরে 'রামসা' বলিয়া ডাকিতেন, তদনুসারে নবকুমার প্রাপ্তবয়সেও 'রাজা রামসা' নামেই খ্যাত হইলেন। ষোড়শ বৎসর বয়সেই রাজা রামসা রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

রাজা রামসা।

শিশুকালে পিতৃহীন হওয়ায় এবং একমাত্র পুত্র বলিয়া রাজা রামসা সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই করিতেন এবং কোন বিষয়ে কাহারও কোন বাধা বিঘ্ন গ্রাহ্য করিতেন না। এইরূপ ভাবে বাল্যজীবন গঠিত হওয়ায় যৌবনে রাজা রামসা স্বেচ্ছাচারী

ও হৃদয়হীন হইয়াছিলেন। রাজ্যভার হস্তে লইয়া তিনি অধিকতর অত্যাচারী হইয়া পড়িলেন। কর্ম্মচারিবর্গ, ভৃত্য সমূহ ও প্রকৃতিপুঞ্জ রামসার দুর্ব্যবহারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সে সময়ে দেশে সুশাসন ছিল না, যে সকল ভূস্বামী দুর্দ্দান্ত ও শক্তিশালী হইতেন, তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণকে বিবিধ প্রকারে নির্যাতিত করিতে ভাল বাসিতেন। যে সকল হিতৈষী কর্ম্মচারী সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া রামসার স্বেচ্ছাচারে বাধা দিতেন এবং সদুপদেশ দিয়া তাঁহাকে সৎপথে আনয়নের চেষ্টা করিতেন, রামসা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিলেন। যাহারা তাঁহার সকল কার্য্যই অনুমোদন করিত, তাহারাই তাঁহার প্রিয় হইয়াছিল। রাজ্যভার গ্রহণের কিছু দিন পরেই রামসা প্রজাগণের উপর নানারূপে অত্যাচার করিতে লাগিলেন, বিবিধ প্রকার কর স্থাপন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে নিরীহ প্রজাসকলের অর্থ-শোষণ করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত হইল। অল্পদিনেই কোষাগার ধনরত্নে পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের পর সৈন্যসংখ্যা অধিক-পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন। এইরূপে বলসঞ্চয় হইলে রামসা নিকটবর্ত্তী ভূস্বামিগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাদের রাজ্যে সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে নানা-প্রকারে নির্যাতিত করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের ধনরত্ন বলদর্পে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিলেন। রামসার নিষ্ঠুর

ব্যবহারে এবং দারুণ অত্যাচারে প্রজাবর্গ ও পার্শ্ববর্ত্তি ভূস্বামী সমূহ অতিমাত্র বিব্রত, বিপন্ন এবং চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ক্রমেই জনসাধারণের রামসার অত্যাচার অসহনীয় হইল এবং আর তাহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া বাদসাহ-সমীপে রামসার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ব্যবস্থা করিল। অনেক হৃতসর্ব্বস্ব জমিদার স্বয়ং দিল্লী গমন করিলেন; তাঁহারা বহু নিগৃহীত প্রজা, এবং অত্যাচার-পীড়িত সাধারণ ব্যক্তিকেও সঙ্গে লইলেন। এই সকল ব্যক্তি যথাকালে দিল্লী পঁহুছিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাজা রামসার অত্যাচার-কাহিনী যথাযথ বর্ণন করিয়া সম্রাট-সমীপে অভি-যোগ উপস্থাপিত করিলেন। তৎকালে তোগলকবংশীয় গিয়াসুদ্দিন দিল্লীর সম্রাট্। সম্রাট্ রাজা রামসার ভীষণ অত্যাচারের কথা শুনিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন; তিনি বর্ণিত বিষয়ের সত্যাসত্য অনুসন্ধানেরও আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। তৎক্ষণাৎ প্রধান অমাত্যকে রাজা রামসার বিরুদ্ধে পাঁচ সহস্র সৈন্য প্রেরণের ও রাজাকে ধৃত করিয়া আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল এবং পাঁচ সহস্র সৈন্য রামসার বিরুদ্ধে বঙ্গদেশে অভিযান করিল। সৈন্য প্রেরণের সংবাদ অল্প-দিনের মধ্যেই রাজার কর্ণগোচর হইল। এই সংবাদে রামসা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া প্রভূত অর্থব্যয়ে স্বীয়

সৈন্যসংখ্যা পাঁচ গুণ বৃদ্ধি করিলেন এবং নানাপ্রকারে বিশিষ্ট বল সঞ্চয় করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে বাদসাহ-প্রেরিত সৈন্যগণ রামসার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ জন্য রামসাকে আহ্বান করিল। রাজা রামসাও এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, অনতি-বিলম্বে উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তিন দিন তিন রাত্রি ঘোর যুদ্ধের পরও কোন পক্ষের জয়-পরাজয় স্থির হইল না। চতুর্থ দিনে রাজা স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এই দিন তাঁহার সৈন্যগণ অধিকতর উৎসাহ ও বিক্রমসহকারে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল, এই দিনের ভীষণ আক্রমণ যবনসৈন্য সহ্য করিতে পারিল না, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই সম্রাটসৈন্য সম্পুর্ণভাবে পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইল।

যথাকালে সম্রাটের নিকট এই শোচনীয় পরাজয়-বার্ত্তা পঁহুছিলে তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রধান সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন যে, তুমি স্বয়ং লক্ষাধিক সৈন্যসহ অদ্যই বঙ্গদেশে যাত্রা কর এবং রাজা রামসাকে পরাজিত করিয়া তাহার ছিন্নমস্তক আমার সমক্ষে লইয়া আইস। সম্রাট-দরবারে রাজা রামসার গুপ্তচর ছিল। বাদসাহের এই আদেশ রামসার নিকট অতি শীঘ্র পঁহুছিতে কালবিলম্ব হইল না। সম্রাটের

এই বজ্রকঠোর আদেশ এইবার অকুতোভয় দুর্দ্দান্ত রামসার হৃৎকম্প উপস্থিত করিল এবং তিনি ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলেন। এই দারুণ সঙ্কটসময়ে রাজা বাজবসন্তের মন্ত্রগুরু ব্রহ্মচারী রামসার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে তখনও জীবিত আছেন, রামসার তাহা ধারণা ছিল না। ব্রহ্মচারী দর্শনমাত্র রামসা দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণ করিলেন এবং 'প্রভু আপনি কে?' এই বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, আমিই তোমার পিতৃদেব—বসন্তকুমারের গুরু, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতায় এবং অতিদর্পে যে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে সবংশে ধ্বংস করিবে। বিধাতার করুণায় তোমাদের বংশে যে সৌভাগ্যসূর্য্যোদয় হইয়াছিল, তোমা হইতে অচিরে তাহা অস্তমিত হইবে। এই সকল কথা বলিবার সময় ব্রহ্মচারীর নেত্র হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া রামসাকে দগ্ধ করিতেছিল। রামসা ভয়-চকিতভাবে ব্রহ্মচারীর চরণে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মচারীর হৃদয় গলিয়া গেল, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রাজার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন এবং রাজাকে প্রিয়বচনে আশ্বস্ত করিয়া অভয় দান করিলেন।

ব্রহ্মচারী সেই দিনই রাজপরিবারবর্গকে কোন গুপ্তস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া রাজভবন রক্ষার যথাসম্ভব বন্দবস্ত

করিলেন এবং রাত্রিকালে রামসাকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোথাও বিশ্রাম না করায় তাঁহাদের দিল্লী পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হইল না। এক মুসলমান ফকির বাদসাহের অতি প্রিয় ছিলেন, এই ফকিরকে বাদসাহের কিছুই অদেয় ছিল না। সেই ফকিরের যে কোন প্রার্থনা বাদসাহ অকুণ্ঠিতচিত্তে পূর্ণ করিতেন। ব্রহ্মচারী রামসা সহ ফকিরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে হিন্দু-সন্ন্যাসীকে ফকিরেরা সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। ব্রহ্মচারী ফকিরের নিকট রাজা রামসার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং বিশেষভাবে যাবতীয় বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, আপনার কৃপা ব্যতীত রামসাকে রক্ষা করিবার কোন উপায় নাই, দয়া করিয়া আপনি শরণাগত রাজাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্মচারীর বাক্যে এবং রাজার করুণ প্রার্থনায় ফকিরের কোমলচিত্ত বিগলিত হইল এবং রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য ফকির প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। ফকির কহিলেন, আগামী প্রভাতে আমি আপনাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাদসাহ-সমীপে গমন করিব এবং তাঁহার নিকট রামসার জীবন ভিক্ষা করিব। বাদসাহকে প্রথমে আপনাদের কোন পরিচয় দান করিব না, আমি যে সময়ে তাঁহাকে সকল বিবরণ বলিয়া তাঁহার নিকট রাজার জীবন ভিক্ষা করিব, ঠিক সেই সময়ে রাজা তাঁহার দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্র-

ভাগ কর্ত্তন করিয়া রক্তাক্তহস্তে বাদসাহসমক্ষে দণ্ডায়মান হইবেন।

পরামর্শানুসারে পরদিন প্রভাতে ফকির, ব্রহ্মচারী ও রাজাকে সঙ্গে লইয়া সম্রাট-ভবনে উপস্থিত হইলেন। সম্রাট্ সসম্মানে ফকিরকে অভ্যর্থনা করিয়া, অসময়ে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ফকির কহিলেন, আপনার নিকট অদ্য একজন হিন্দুর জীবনভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। সম্রাট্ কহিলেন, আপনার প্রার্থনা আমি আদেশের নামান্তররূপেই পূর্ণ করি, কিন্তু দয়া করিয়া আপনি বাঙ্গালার রাজা রামসার বিষয়ে কোন প্রার্থনা করিবেন না। ফকির বলিলেন, এই বিশাল ভারতভূমির আপনি অদ্বিতীয় অধীশ্বর, প্রজাগণ আপনার পুত্রকল্প; নির্ব্বুদ্ধিতাহেতু কেহ কোন অপরাধ করিলে আপনি যদি অপরাধীকে ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? বিশেষতঃ শরণাগতকে ক্ষমা করাই রাজধর্ম্ম। রাজা রামসা যৌবনসুলভ চপলতা-হেতু মহাভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছেন। এই রাজা রামসা অদ্য আপনার দয়ার ভিখারী হইয়া চরণতলে উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন। ফকিরের মুখ হইতে এই কয়টী কথা উচ্চারিত হইবামাত্র, রাজা তীক্ষ্ণ ছুরিকায় ক্ষিপ্রহস্তে স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ ছেদন করিয়া রক্তাক্ত

অবস্থায় অবনতমস্তকে সাশ্রুনেত্রে সম্রাট্-সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ফকির কহিলেন, আপনি রাজা রামসার ছিন্ন-মস্তক আনয়নের আদেশ দিয়াছেন, রাজা—স্বয়ং আপনার আদেশের আংশিক পালন করিয়া ক্ষমা চাহিতেছেন। অতঃপর তাঁহার প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন হউন। ফকিরের অনুরোধে এবং এই করুণদৃশ্যে সম্রাটের হৃদয় বিচলিত হইল, তিনি রাজাকে ক্ষমা করিয়া অভয়প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ এই বিবরণ প্রধান সেনাপতির নিকট অশ্বারোহী দূতের দ্বারা প্রেরিত হইল এবং সেনাপতিকে সসৈন্যে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। ভবিষ্যতে রাজা রামসার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ আমাকে যেন শুনিতে না হয় এবং তিনি যেন সুশাসনে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, এইরূপ উপদেশ দিয়া রাজা রামসাকে সম্রাট্ বিদায় দিলেন।

ফকিরকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া ব্রহ্মচারী ও রাজা দিল্লী ত্যাগ করিলেন। দিল্লী হইতে ব্রহ্মচারী রাজাকে সঙ্গে লইয়া পবিত্র কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, রাজা রামসা তখনও অদীক্ষিত, তিনি রাজাকে মন্ত্রপ্রদান করিয়া ও আবশ্যক উপদেশ দিয়া বলিয়া দিলেন, তোমার বংশাবলী চিরকাল ব্রহ্মচারী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট যেন মন্ত্রগ্রহণ না করেন। রাজা ব্রহ্মচারীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহাভিমুখে

যাত্রা করিলেন। তদবধি একাল পর্য্যন্ত মলুটীর রাজবংশীয়েরা ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। বারাণসীধামে গণেশ মহল্লায় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের যে মঠ আছে, সেই মঠের অধিকারী, কাশী নরেশের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়েন এবং মঠের রক্ষণাবেক্ষণ ও মঠস্থিত দেবদেবীর পূজা ও সেবাকার্য্য ব্রহ্মচারী দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। এই ব্রহ্মচারীই মলুটী রাজবংশের মন্ত্রদাতা গুরু। চিরন্তন প্রথানুসারে বৎসরান্তে একবার করিয়া ব্রহ্মচারীকে মলুটীতে শুভাগমন করিতে হয় এবং রাজবংশীয়দিগের অদীক্ষিতকে মন্ত্র দিতে হয়। রাজা রামসা গৃহ প্রত্যাগত হইয়া যে কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয়েক বৎসর প্রকৃত নরপালক ভূপতির ন্যায় প্রজাপালন করিয়া শেষ-জীবনে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং বিবিধ সংকীর্ত্তিসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া প্রথম জীবনের পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

রাজা জয়চন্দ্র প্রভৃতি

রাজা রামসার মৃত্যুর পর তাঁহার পরবর্ত্তী কয়েক পুরুষ উত্তরাধিকারীর নাম এবং তাঁহাদের রাজ্য-শাসনের কোন

বিবরণ পাওয়া যায় না। একেবারে রাজা জয়চন্দ্রের নাম ও বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে এবং জয়চন্দ্র হইতে একাল পর্য্যন্ত পর পর বংশাবলী বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রাজা জয়চন্দ্র কাটীগ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া পাঁচ মাইল পশ্চিমে ডামরা নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজা জয়চন্দ্র কি কারণে কাটীগ্রামের বাস ত্যাগ করিলেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কাটীগ্রাম এখনও মলুটীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্তই রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কাটীগ্রামে কতকগুলি নিরীহ নিরক্ষর কৃষকমাত্র বাস করে। রাজা জয়চন্দ্রের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা নাই। জয়চন্দ্র দীর্ঘকাল অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অধিকৃত স্থান-সমূহের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার সুবন্দবস্ত করিয়াছিলেন, বহুগ্রামে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া প্রজাগণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। জয়চন্দ্রের নাম-সংযুক্ত অনেক কীর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ডামরা গ্রামে "জয়সাগর" নামক এরূপ এক বৃহৎ পুষ্করিণী আছে যে, সেরূপ পুষ্করিণী এতদঞ্চলে সচরাচর দৃষ্ট হয় না, "জয়সাগরের" মধ্যস্থলে এক বৃহৎ মঞ্চোপরি উপবেশনের কাষ্ঠনির্ম্মিত একটী আসন রহিয়াছে। এ দেশে এই আসনকে সাধারণ লোকেরা "থুনি" বলিয়া থাকে।

রাজা জয়চন্দ্র গ্রীষ্মকালে সান্ধ্য-সমীরণ সেবন জন্য এই আসনে উপবিষ্ট হইতেন।

রাজা জয়চন্দ্র, রাজচন্দ্র, রামচন্দ্র ও মহাদেব নামক তিন উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। মৃত্যু-কালে তিনি একখানি উইল সম্পাদন করেন, তাহাতে জ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজচন্দ্রকে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ ও রাজা উপাধি গ্রহণের অধিকার এবং রামচন্দ্রকে সিকি ও মহাদেবকে সিকি অংশ দিয়া যান। রাজা জয়চন্দ্র এইভাবে বিষয় বিভাগ করিয়া দিলেও পিতার পরলোক গমনের পর তিন ভ্রাতা একান্নবর্ত্তিভাবেই গার্হস্থ্যাশ্রম প্রতিপালন করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র ও মহাদেব সর্ব্বতোভাবে জ্যেষ্ঠের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন। তিন ভ্রাতার সম্মিলিত সুশাসনে রাজ্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সর্ব্বপ্রকারে সুখ-স্বচ্ছন্দতা সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল।

এই সময়ে বীরভূমের নিকটবর্ত্তী রাজনগরের মুসলমান ভূস্বামীগণের বিশেষ অভ্যুদয় হয়। রাজা রাজচন্দ্রের সময়ে আলিলকি খাঁ নামক বিখ্যাত মুসলমান ভূস্বামী রাজনগরের অধিকারী হয়েন। আলিলকি খাঁ দুর্দ্দান্ত ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যলিপ্সা অত্যন্ত বলবতী ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামিগণ আলিলকির অত্যাচারে বিব্রত ও ব্যতি-ব্যস্ত হইয়াছিলেন এবং বলদর্পে আলিলকি অনেক দুর্ব্বল

নিরীহ জমিদারের সম্পত্তি হরণ করিয়া লয়েন। অল্পদিনের মধ্যেই আলিলকির শ্যেন-দৃষ্টি রাজা রাজচন্দ্রের সম্পত্তির উপর পতিত হইল। বিশেষতঃ আলিলকির অধিকারের প্রান্তভাগেই রাজচন্দ্রের সম্পত্তি অবস্থিত। আলিলকি রাজচন্দ্রের প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জোর-জুলুমে খাজনা আদায় করিতে লাগিলেন। বহুপ্রজা অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, নিরুপায়ে আলিলকির বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। যথাসময়ে এই সকল সংবাদ রাজচন্দ্রের নিকট পঁহুছিলে, তিনি কর্কশভাষায় পত্র লিখিয়া আলিলকিকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিলেন। সাবধান হওয়া দূরের কথা, পত্রপাঠে আলিলকির ক্রোধ অধিকতর বৃদ্ধি হইল এবং তিনি অল্পদিনের মধ্যে সসৈন্যে ডামরার প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া শিবিরস্থাপন করিলেন ও রাজ-চন্দ্রের রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজা রাজচন্দ্র বলবিক্রমে আলিলকি অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। তিন ভ্রাতায় একত্রভাবে বহু-সৈন্য-সমিভিব্যহারে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, সাত দিন ধরিয়া অনবরত যুদ্ধ চলিতে লাগিল, এবং উভয় পক্ষের বহুসৈন্য হতাহত হইল। সপ্তাহব্যাপী ভীষণ সংগ্রামে আলিলকি হীনবল হইয়া পড়িলেন, অষ্টম দিবসে তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার বহুসৈন্য

রাজার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া কারারুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধের এক বৎসর পরে আলিলকি রাজচন্দ্রের রাজধানী পুনরাক্রমণ করেন এবং এবারও বহুসৈন্যের জীবন আহুতি দিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েন। তৎপরে তিন বৎসর কাল আলিলকি নীরব ছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র ও মহাদেব তীর্থ-ভ্রমণ-মানসে সপরিবারে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমন করেন।

উপর্য্যুপরি দুইবার আলিলকি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া বিশেষ হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই হেতু তিন বৎসর কাল আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই লজ্জাজনক পরাজয়ের অপমান তিনি ভুলিতে পারেন নাই। এই তিন বৎসরকাল নানাপ্রকারে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং সৈন্যসংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি গৃহদগ্ধা গাভীর রক্তসন্ধ্যা দর্শনে ভীতির ন্যায় রাজচন্দ্রের রাজ্যে আবার আসিতে সাহসী হইতে ছিলেন না। তাঁহার চির-সঞ্চিত বৈরনির্য্যাতনের চরিতার্থতাসাধনহেতু সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রামচন্দ্র ও মহাদেবের তীর্থগমন সংবাদ আলিলকির কর্ণে পঁহুছিল এবং ইহাই শুভসুযোগ ভাবিয়া অবিলম্বে আলিলকি ডামরা অভিমুখে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। আলিলকি এরূপ সংগোপনে ডামরায়

উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, রাজা রাজচন্দ্র সে সংবাদ কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। বিশেষতঃ রাজা রাজচন্দ্র সদা সর্ব্বদা ঈশ্বরোপাসনায় ব্যাপৃত রহিতেন এবং তাঁহার ভ্রাতারাই রাজকার্য্য পরিদর্শনাদি করিতেন। আলিলকি অতর্কিতভাবে রাত্রিযোগে রাজধানী আক্রমণ করিলেন। রাজচন্দ্রের বিশ্বস্ত সৈন্যবর্গ প্রাণপণে বাধা দিয়া সমস্তরাত্রি তুমুল সংগ্রাম করিল, কিন্তু এবার আলিলকি যেরূপভাবে সজ্জিত ও সঞ্জাতবল হইয়া আসিয়াছেন, তাহাতে রাজা রাজচন্দ্রের সৈন্যগণ সহসা আলিলকির কিছুই করিতে পারিল না। অধিকন্তু মধ্যে মধ্যে তাহাদেরই পরাজয়-সম্ভাবনা অধিক হইয়া উঠিল। ডামরার প্রান্তভাগে এক বিস্তীর্ণ বন ছিল, সেই বনের মধ্যে উভয় পক্ষে প্রবলভাবে যুদ্ধ হইতেছিল। রাত্রি প্রভাতে যখন রাজচন্দ্র শুনিলেন যে, তাঁহার সৈন্যগণেরই পরাজিত হইবার অধিক সম্ভাবনা, তখন তিনি আর স্থির রহিতে পারিলেন না। রাজভবন রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাজাকে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে আগত দেখিয়া রাজচন্দ্রের সৈন্যগণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া পড়িল এবং প্রবল উৎসাহে প্রাণপণে ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল। রাজার সৈন্যগণের। বলবিক্রম দেখিয়া আলিলকি স্তম্ভিত হইলেন এবং তিনিও তাঁহার

সৈন্যগণকে বার বার উত্তেজিত করিয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। অদ্যকার সমরের পরিণাম বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং রাজচন্দ্রের সহস্র চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে ব্যর্থ হইতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে যবন-সৈন্যের ভীষণ শেষ আক্রমণ রাজার সৈন্যগণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না এবং আর তাহারা রণস্থলে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতেও সমর্থ হইল না। ক্রমেই রাজার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রাজচন্দ্র কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে ঘৃণাবোধ করিলেন। যে সকল সৈন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিল না, তিনি তাহাদিগকে মাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সহস্রাধিক যবনসৈন্য রাজাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। অল্পক্ষণেই রাজচন্দ্র পরাজিত হইলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে আলিলকি তথায় উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে তীক্ষ্ণধার তরবারি দ্বারা রাজা রাজচন্দ্রের মস্তক দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন! রাজা রাজচন্দ্রের দেহের রক্ত যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে বহুসংখ্যক কালবর্ণের তুলসীবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল। এখনও সেই স্থানে অনেক স্থান ব্যাপিয়া কাল তুলসীর গাছ বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজা বাজবসন্ত বাদসাহ আলাউদ্দিনের নিকট যে দলুই জাতীয় বাঙ্গালী

সেনাপতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সেনাপতির বংশধরেরাই বাজবসন্তের বংশাবলীরও সেনাপতির কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। রাজা রাজচন্দ্রের সেনাপতির নাম নারায়ণ দলুই। নারায়ণ এ বারের যুদ্ধের পরিণাম বুঝিয়াছিল এবং রাজা কাপুরুষের ন্যায় রণে ভঙ্গ না দিয়া সম্মুখসমরে জীবন দান করিবেন, তাহাও বুঝিয়াছিল। এই জন্যই নারায়ণ রণস্থল ত্যাগ করিয়া আসিয়া রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাণীমাতাকে সকল সংবাদ জ্ঞাত করিয়া বলিল, মা! যদি যবনহস্তে বন্দিনী না হইবার ইচ্ছা থাকে, যদি হিন্দুরমণীর পবিত্রতা রক্ষা করিতে চাহেন, যদি অপগণ্ড শিশুদিগের জীবন রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ করেন—তাহা হইলে ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া এই রাজভবন পরিত্যাগ করুন, এখনই যবনেরা অন্তঃপুর আক্রমণ করিবে। আমার সঙ্গে আসুন, কোন গুপ্তস্থানে রাখিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিব। আপনি আমাদের জননী, দেহে যাবৎ একবিন্দু রক্ত রহিবে, ততক্ষণ আপনার কেহ কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না। রাণী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, শিশুগণসহ নারায়ণের সঙ্গে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই মুসলমানেরা রাজগৃহ আক্রমণ করিয়া কোষাগারের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং অবশেষে গৃহে মধ্যে অগ্নিসংযোগ করিয়া প্রস্থান করিল।

ডামরার চারি মাইল উত্তরে মলুটী, সে সময়ে এই স্থান হিংস্র জন্তুসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পূর্ণ ছিল। এই স্থানে রাজা রাজচন্দ্রের এক গুপ্ত গৃহ ছিল। নারায়ণ সে সংবাদ জানিত এবং রাণীমাতা ও শিশুদিগকে সঙ্গে লইয়া এই গুপ্তগৃহে উপস্থিত হইল। শিশুদিগকে লইয়া রাণীমাতা আপাততঃ এই গৃহেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং রামচন্দ্র ও মহাদেবের তীর্থ হইতে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। নারায়ণ তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষা করিত এবং তাঁহাদের যাহা কিছু অভাব ও আবশ্যক, সে সমুদায়ই সংগ্রহ করিয়া দিত। নারায়ণের ন্যায় বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য না থাকিলে রাজচন্দ্রের বংশ নিশ্চিহ্নরূপে ধ্বংস হইয়া যাইত। রাজচন্দ্রের বংশাবলী আজও কৃতজ্ঞতাভরে নারায়ণের নাম সর্ব্বদাই স্মরণ করিয়া থাকেন।

যে সময়ে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইল, তখন রামচন্দ্র ও মহাদেব দেশ-দেশান্তরে তীর্থদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে রেলওয়ে-সাহায্যে তীর্থ ভ্রমণ যে প্রকার অনায়াস-সাধ্য ও নিরাপদ হইয়াছে, তৎকালে সেরূপ ছিল না। তখন হিংস্রজন্তুসমাকুল গভীর বন-জঙ্গল, ক্ষুদ্র বৃহৎ পাহাড়-পর্ব্বত এবং ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল নদ-নদী অতিক্রম করিয়া পদব্রজে-পবিত্র তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইত। দস্যু-তস্করের উপদ্রব, হত্যাকারিগণের

গুপ্ত আক্রমণ প্রভৃতি বিবিধ বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে, জীবন হাতে করিয়া পথ অতিক্রম করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। তীর্থযাত্রিগণ গৃহপ্রত্যাগমনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনের নিকট এক প্রকার চির-বিদায় লইয়াই গমন করিত! রামচন্দ্র ও মহাদেব গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি পবিত্র ধাম-সমূহ দর্শন করিয়া যে সময়ে হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের প্রাণের ভিতর অজ্ঞাতসারে কি এক যন্ত্রণা-দায়ক গভীর আকুলতা উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। হরিদ্বার হইতে স্থানান্তরে যাইবার সংকল্প তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমি অভিমুখে রওনা হইলেন। ঐরূপ বিপজ্জনক তীর্থভ্রমণের কার্য্য নিরাপদে শেষ করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের চরণতলে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি কতই আনন্দ উপভোগ করিবেন—এই আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা উৎফুল্লহৃদয়ে দিনের পর দিন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে কিছুদিন মধ্যেই তাঁহারা ডামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গ্রামবাসী কেহ সেই ভীষণ দুঃসংবাদ তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে সাহসী হইল না। তাঁহারা একেবারে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজভবন জন-মানব শূন্য, যে গৃহে তাঁহারা মহাসমাদরে অভ্যর্থিত

হইবার সুখময় কল্পনা করিতেছিলেন, তথায় মহাশ্মশানের বিভীষিকাপূর্ণ ভীষণ দৃশ্য যেন তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। দেবগৃহ সমুদায় ভগ্ন, অট্টালিকা সকল অগ্নিদগ্ধ, মনোরম প্রমোদোদ্যান ছিন্নভিন্ন, এই সকল দেখিয়া তাঁহাদের অন্তরে তখন কি যে হইতেছে তাহা ভাষার সাহায্যে ব্যক্ত করা বিড়ম্বনামাত্র। তাঁহাদের ক্ষণকাল ধৈর্য্যধারণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। অতিমাত্র উৎকণ্ঠা-সহকারে গ্রামবাসিগণের নিকট সকল সংবাদ জ্ঞাত হইলেন, এবং সেই লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক ভীষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া যে স্থানে জ্যেষ্ঠ সহোদর যবনহস্তে হত হইয়াছেন, ভ্রাতৃদ্বয় উন্মত্তপ্রায় দ্রুতগতিতে তথায় উপনীত হইলেন। হত্যাভূমি দেখিয়া উভয় ভ্রাতা বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন এবং রাজচন্দ্রের রক্তপ্লাবিত স্থানে মৃত্তিকার উপর পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে, রামচন্দ্র কহিলেন, ভ্রাতঃ! এক্ষণে এইস্থানে আর অপেক্ষা করা অথবা রমণীর ন্যায় শোকে অধীর হইয়া বিলাপ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে, যেখানে মাতৃরূপিণী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া স্বামিশোকে দিবস-যামিনী হাহাকার করিতেছেন, সেই স্থানে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করি। রামচন্দ্রের বাক্যে মহাদেবের চৈতন্য হইল। উভয় ভ্রাতায় উন্মাদের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ভ্রাতৃজায়া দর্শনে

ছুটিলেন এবং অতি অল্প সময়েরমধ্যে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া মা মা রবে হতভাগিনী বিধবার চরণোপরি পতিত হইলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, মাগো! কোন্ দেবতার অভিসম্পাতে আমাদের এই সর্ব্বনাশ ঘটিল! কেন আমাদের তীর্থদর্শনের দুর্ম্মতি হৃদয়ে স্থানপাইয়াছিল! এই অসহনীয় ভ্রাতৃশোক যে সহ্য করিতে পারি না মা! তোমার এই যোগিনী-মূর্ত্তি দেখিবার পূর্ব্বে কেন আমাদের মৃত্যু হইল না। কেন আমরা তীর্থদর্শন করিয়া দেশে ফিরিলাম। হায়! হায়! আজ আমরা আমাদিগের সেই মাথার মণি, প্রাণের দেবতাকে হারাইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব! রামচন্দ্র ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে করুণদৃশ্যে পাষাণ গলিয়াছিল; বনের পশুপক্ষীও কাঁদিয়াছিল। রাণীর কিঞ্চিৎ প্রশমিত শোকাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে, অতি-কষ্টে তাহা সংবরণ করিয়া কহিলেন, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে। নিয়তির বিধানে হতভাগিনী আমি, রাজরাণী হইয়া পথের ভিখারিণী হইয়াছি। এক্ষণে শোক পরিহার কর, বীরের সন্তান তোমরা, যে পামর নিষ্ঠুরভাবে তোমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করিয়াছে, বীরের ন্যায় তাহার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া আমার মানস-শ্মশানে যে চিতার আগুন অহোরাত্র জ্বলিতেছে, তাহা নির্ব্বাণ করিয়া স্বর্গীয় ভ্রাতার

অমরাত্মার শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ কর। রাণীর এই জ্বালাময়ী বাক্যে উভর ভ্রাতার মোহ ভাঙ্গিল, আলিলকিকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সমক্ষে কঠোর প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন।

তৎপরদিন হইতেই তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি নারায়ণ পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সৈন্য-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিল। বর্ত্তমান মলুটী তৎকালে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, দ্রুতগতিতে বাসোপযোগী স্থানের বন জঙ্গল পরিষ্কৃত হইল। গ্রামের দক্ষিণে নদীর উপর এক প্রকাণ্ড গড় প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইল। আবশ্যক গৃহাদি প্রস্তুত হইতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না। অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মলুটী বনময়ী মূর্ত্তি পরিহার করিয়া রাজধানীর মনোমুগ্ধকর শোভায় শোভান্বিত হইল। আলিলকি বলদর্পে যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র ও মহাদেব কর্ত্তৃক অচিরেই তাহা পুনরধিকৃত হইল। উভয় ভ্রাতার বলবিক্রমের কথা আলিলকির অজ্ঞাত ছিল না, আর তিনি অগ্রসর হইয়া বাধাপ্রদানে সাহসী হইলেন না। সম্পত্তিসমূহের পুনরধিকার শেষ হইলে, বৈরনির্য্যাতনের শেষ প্রতিজ্ঞার কথা শোকতাপদগ্ধ উভয় ভ্রাতার স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিল। আলিলকির রাজ্য আক্রমণ করিবার উদ্যোগ ও ব্যবস্থা

চলিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না। ঠিক এই সময়ে তাঁহারা আলিলকির ভীষণ সংক্রামক ব্যাধিতে সহসা দেহত্যাগের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। রামচন্দ্র ও মহাদেবের কঠোর প্রতিজ্ঞা বিধাতার ইঙ্গিতে অপূর্ণ রহিয়া গেল।

এই বিশাল বিশ্বের যাহা কিছু, সবই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। মানুষের দুঃখক্লেশ যখন চরমে উঠে, তখন তাহার অবসান হয়, অনাবিল সুখ-শান্তি তাহার স্থানে আত্মপ্রভাব বিস্তার করে। আবার সুখ-শান্তি সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিয়া দুঃখ-ক্লেশকে সাদর আহ্বানে মানুষের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। যে ভাগ্যদেবী রাখাল-বালককে বক্ষে ধারণ করিয়া রাজ সিংহাসন দিয়াছিলেন, তিনিই যে তাঁহার বংশধরকে মুহূর্ত্ত-মধ্যে নিষ্ঠুরভাবে পথের ভিক্ষুক করিবেন, স্বপ্নেও একথা অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। এই জন্যই আমরা রাজচন্দ্রের শোচনীয় পরিণামে স্তম্ভিত হইয়াছি, কিন্তু বিশ্বপতির অনন্ত লীলার অভিনয় এইভাবেই প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে। রাজচন্দ্রের পতনে সুখের অবসান ঘটিয়া বংশাবলীকে দৈন্য-ক্লেশে জর্জ্জরিত করিল, কিছুদিন বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া সেই ভাগ্যলক্ষ্মী আবার সোহাগভরে তাহাদিগকে বুকে তুলিয়া লইলেন। রামচন্দ্র ও মহাদেবের প্রাণপাত বিপুল চেষ্টা-যত্নে অচিরে পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিল। এক্ষণে অতীতের বিষাদময়ী স্মৃতি নিশ্চিহ্নভাবে মুছিয়া গিয়াছে। রাজপরিবার

আনন্দের বিমল স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিনের পর দিন পরম সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শোকের বা ক্লেশের প্রভাব সমভাবে থাকিলে মানুষ বুঝি পাষাণ হইয়া যাইত। এই জন্য ধীরে ধীরে তাহার তীব্রতা হ্রাস হইয়া আবার মানুষকে নবোদ্যমে সংসার-নাট্য-শালায় মাতোয়ারা করিয়া তুলে।

এই সময়ে কাশীধাম হইতে জনৈক ব্রহ্মচারী মলুটীতে শুভাগমন করিলেন। এই ব্রহ্মচারীই তখন শঙ্করা চার্য্যের মঠের মহন্ত। কুলপ্রথানুসারে ইহাঁর নিকটই রাজবংশীয়-দিগকে দীক্ষিত হইতে হইবে। ব্রহ্মচারী অজ্ঞাত-কুল-শীল হইলেও, বংশাগত প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেই হইবে ভাবিয়া, রাজবংশের অধিকাংশই তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে রামচন্দ্রের ব্রহ্মচারীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আসিল না। তিনি মন্ত্রগ্রহণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে রাম-চন্দ্রের মতের বিরুদ্ধে কাহারও কোন মত প্রকাশ করা সাধ্যের অতীত, সুতরাং ব্রহ্মচারীর আদেশমত কার্য্য করিতে কেহই সাহসী হইলেন না। রামচন্দ্রের মনোভাব ব্রহ্মচারী বুঝিতে পারিয়া একদিন প্রভাতে তিনি রামচন্দ্রের গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী দেখিবামাত্র বাড়ীর পরিবারবর্গ ব্রহ্মচারীকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া সকলে দণ্ডবৎ প্রণাম

করিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের মস্তক ব্রহ্মচারীর চরণে অবনত হইল না। ব্রহ্মচারার হস্তে যে কমণ্ডলু ছিল, তাহা সুরাপূর্ণ, রামচন্দ্র এই বিশ্বাসে উপনীত হইলেন। রামচন্দ্রের বিশ্বাস অমূলক নহে, সত্যসত্যই কমণ্ডলু সুরাতে পরিপূর্ণ ছিল। কমণ্ডলুতে কি আছে, বলিয়া রামচন্দ্র ব্রহ্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন। ব্রহ্মচারী কহিলেন, তোমাকে অদ্য শুভদিনে দীক্ষা দিবার জন্য কমণ্ডলুতে গঙ্গাবারি লইয়া আসিয়াছি। ব্রহ্ম-চারীর উত্তরে রামচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, ইহা গঙ্গাবারি কি অন্যকিছু, হস্তে লইয়া পরীক্ষা কর, এই বলিয়াই তিনি রামচন্দ্রের হস্তে কিঞ্চিৎ বারি প্রদান করিলেন, রামচন্দ্র তাহা হস্তে লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এইবার ব্রহ্মচারীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ক্রোধভরে রামচন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন; কহিলেন, তুমি অহঙ্কারে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকে অপমানিত করিলে। এই ইচ্ছাকৃত পাপের দণ্ড তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে, তুমি অল্পায়ু হইয়া অচিরে পঞ্চত্ব লাভ করিবে। অভিশাপ দিয়া ব্রহ্মচারী রামচন্দ্রের গৃহসংলগ্ন ঠাকুর-মন্দিরের সমীপস্থ হইয়া গুরুগম্ভীরস্বরে নারায়ণশিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রভু, তুমি এই অদীক্ষিত নাস্তিকের সেবা গ্রহণ করিও না, তোমার সমক্ষে তোমার ভক্তের অবমাননা প্রত্যক্ষ করিয়া এখনও যদি তুমি এই পাপ মন্দিরে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে

দুরাচার পাষণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এই পবিত্র ধর্ম্ম-রাজ্যকে দানবের লীলাভূমি করিয়া তুলিবে। ব্রহ্মচারীর আকুল নিবেদন ঠাকুরের কর্ণে পঁহুছিল, সহসা সিংহাসন হইতে নারায়ণ-শীলা ভূমিতে পতিত হইয়া দ্বিখণ্ড হইয়া গেল! এই বিস্ময়াবহ অলৌকিক ঘটনায় রামচন্দ্রের বীরহৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; পরিবারবর্গ অতিমাত্র ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। মহাদেব রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারীর চরণোপান্তে পতিত হইলেন এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মচারীর কৃপা ভিক্ষা করিলেন। তাঁহাদের কাতর-ক্রন্দনে ব্রহ্মচারীর ক্রোধ উপশমিত হইলে, তিনি কহিলেন, আমার অভিসাপ ব্যর্থ হইবার নহে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন শিষ্যের অপরাধ মার্জ্জনীয় হইলেও যাহা বলিয়াছি, আর তাহা প্রত্যাহারের অন্য কোন উপায় নাই, তবে অভিশাপ কার্য্য-কারী হইলেও আমার দ্বিতীয় আদেশে রামচন্দ্রের বংশলোপ হইবে না। নিমেষমধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ প্রচারিত হইল। সেই দিনই রাজ-বংশের অদীক্ষিতমাত্রেই ব্রহ্মচারীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার অল্পদিন মধ্যেই রামচন্দ্রের পত্নীর গর্ভ সঞ্চার হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠের পূর্ব্বেই রামচন্দ্র কাল-কবলিত হইলেন। ব্রহ্মচারীর অভিশাপের বাস্তবতা দেখিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। বংশপ্রথার কঠোর

অনুশাসনে রাজবংশীয়দিগের প্রত্যেক গৃহে নারায়ণশিলার সেবা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু তদবধি একাল পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের বংশাবলী নারায়ণ-সেবায় বঞ্চিত রহিয়াছেন।

——o——

রাজা রাখড়চন্দ্র।

রাজা রাজচন্দ্র যে সময়ে যবন-সমরে নিহত হইলেন, তৎকালে তাঁহার রাখড়চন্দ্র, পৃথ্বীচন্দ্র ও স্বরূপচন্দ্র নামক তিনটী শিশুপুত্র বর্ত্তমান ছিল; তদীয় বিধবা পত্নী এই শিশু তিনটীকে নারায়ণের সাহায্যে মলুটীর গুপ্তগৃহে সংগোপনে রক্ষা করিয়া লালন পালন করিয়া ছিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র ও মহাদেব তীর্থ-প্রত্যাগত হইয়া বিপুল চেষ্টা-যত্নে অল্প দিন মধ্যে হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া শিশুত্রয়ের রাজোচিত সুশিক্ষা-বিধানের সর্ব্বাঙ্গীন সুবন্দবস্ত করিয়াছিলেন। সুখের ক্রোড়ে আদরে-সোহাগে লালিত-পালিত হইলেও অসাধারণ প্রতিভাগুণে রাজকুমারেরা অত্যল্প দিন মধ্যেই নানা সদ্‌গুণে ভূষিত হইয়া পড়িলেন। ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে রাখড়চন্দ্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভ করিয়া বিবিধশাস্ত্রে

অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কুমারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাখড়চন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া রাজা উপাধি গ্রহণের অধিকারী হইলেন এবং জয়চন্দ্রের বিভাগ-নিয়মের আদর্শে পিতৃ-সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে সমগ্র সম্পত্তি প্রকারান্তরে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িল এবং রাজা, মধ্যম, সিকি ও দ্বিতীয় সিকি এই চারি তরফে বা নামে অভিহিত হইল। রাখড়চন্দ্রের অধিকৃত সম্পত্তির "রাজার তরফ", পৃথ্বীচন্দ্র ও স্বরূপচন্দ্রের অধিকৃত সম্পত্তির "মধ্যম তরফ", রামচন্দ্রের অধিকৃত সম্পত্তির "সিকির তরফ" এবং মহাদেবের অধিকৃত সম্পত্তির "দ্বিতীয় সিকির তরফ" নামকরণ হইল। তদবধি একাল পর্য্যন্ত বিভক্তসম্পত্তির ঐ সকল নামই চলিয়া আসিতেছে; কেবলমাত্র "দ্বিতীয় সিকির তরফ" নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ছয় তরফ" নাম খ্যাত হইয়াছে। বংশ-বহুলতায় বিপুল সম্পত্তি এইভাবে বিভক্ত হইলেও রাজচন্দ্রের বংশাবলীর জ্যেষ্ঠানুক্রমে রাজা উপাধি গ্রহণের সর্ব্ববাদিসম্মত অধিকার চিরকাল অক্ষুণ্ণ ছিল।

রাজা রাখড়চন্দ্র ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, বিষয়কর্ম্মে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল না। তিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় ও সৎপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার জননী সংসারধর্ম্মে জ্যেষ্ঠপুত্রের এইরূপ অনাস্থা লক্ষ্য করিয়া এক গুণবতী পরমাসুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও রাখড়চন্দ্রের মনের গতি ফিরিল না। তিনি সদাসর্ব্বদা দেবপূজা, ও ধ্যান জপাদিতে ব্যাপৃত রহিতেন। রাখড়চন্দ্রের স্থায় পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শচরিত্র ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ মলুটী-রাজবংশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। এই ঈশ্বরপরায়ণ গৃহযোগীর জীবন-কালের অলৌকিক ঘটনা-পরম্পরা শুনিলে দেহ পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়। রাখড়চন্দ্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণের জন্য নিতান্ত উৎসুক ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে কয়েক বৎসর কাশীধাম হইতে কোন ব্রহ্মচারী রাজধানীতে আইসেন নাই, কুলের প্রদীপ রাখড়চন্দ্র বংশপ্রথা লঙ্ঘন করিয়া অন্য কাহারও নিকট দীক্ষিত হইতে সাহসী হইলেন না। এক দিন রাখড়চন্দ্র পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, পথিমধ্যে দেখিলেন, একজন মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক-বসন-পরিহিত সন্ন্যাসী দ্রুতগতিতে সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। রাখড়চন্দ্র সন্ন্যাসীর সম্মুখস্থ হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন এবং করযোড়ে বিনীতভাবে বলিলেন, আমাদের বংশগত পদ্ধতি অনুসারে আমরা সংসারবিরাগী যোগিসন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকি। আমাদের গুরুদেব বারাণসী ধামে ভাস্করাচার্য্যের মঠে অবস্থিতি করেন, কয়েক বৎসর এখানে তাঁহার শুভাগমন হয় নাই। আমি অদীক্ষিতা-

বস্থায় একটী দিনও অতিবাহিত করিতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ; আপনি দয়া করিয়া আমাকে মন্ত্রপ্রদানে ধন্য করুন। সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি নীলাচলে জগন্নাথদেবের দর্শন কামনায় গমন করিতেছি, এ সময়ে আমি একটী দিনও নষ্ট করিতে পারি না ; আমার নিকট তুমি মন্ত্রগ্রহণের আশা পরিত্যাগ কর। রাখড়চন্দ্রের বিনীত অনুনয়-বিনয়ে কোন ফলই হইল না। সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া দ্রুত-গমনে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। যথাকালে সন্ন্যাসী পুরীধামে পঁহুছিলেন এবং ত্বরিতপদে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলালসায় গমন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসী জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে দ্বারসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু তিনি প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না। শত শত ব্যক্তি, সহস্র সহস্র ভক্ত, মহাপ্রভুর অপরূপ রূপ দর্শনে ধন্য হইয়া সোল্লাসে জয়ধ্বনি করিতেছে, কিন্তু সন্ন্যাসী সবই যেন অন্ধকার দেখিতেছেন, কে যেন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় কোন আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসী ভাবিলেন, পথশ্রমে দেহক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছে, সেই কারণেই দৃষ্টিশক্তির এই প্রকার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে, অদ্য দিনরাত্রি বিশ্রাম করিয়া, আগামী কল্য প্রভাতে প্রভুর দর্শনলাভ করিব, এই বলিয়া তিনি মন্দির পরিত্যাগ করিলেন এবং পরদিন প্রত্যূষে সাগর-স্নান করিয়া

আবার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এদিনেও সন্ন্যাসীর দৃষ্টিশক্তির উন্মেষ হইল না; তিনি সহস্র চেষ্টা করিয়াও জগন্নাথদেবের দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। এইবার সন্ন্যাসীর হৃদয় দমিয়া গেল; তিনি আপনার হানতা উপলব্ধি করিলেন এবং কোন মহাপাপের দণ্ডে প্রভুর কোপে পতিত হইয়াছি, তাহা অনুভব করিলেন। প্রভু দর্শনে বঞ্চিত হইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; তিনি অতিমাত্র অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সংকল্প করিলেন, যাবৎ প্রভুর দর্শন লাভ না ঘটিবে সে পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরে অনাহারে হত্যাদিয়া রহিবেন। অনন্তর সন্ন্যাসী সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন; তৎক্ষণাৎ মন্দির-প্রাঙ্গনে বুক পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসী মহাভক্ত ও সাধক; ভক্তের অকপট আকুল-আবাহনে প্রভুর সিংহাসন মুহূর্ত্তেই টলিয়া যায়; হইলও তাহাই। গভীর নিশীথে সন্ন্যাসী তন্দ্রাভিভূত হইলেন। সেই সময়ে স্বপ্নে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশ-বাণী সন্ন্যাসীর কর্ণগোচর হইল। প্রভু বলিতেছেন;—"তুমি আমার ভক্ত রাজা রাখড়চন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছ, ভক্তের আশাভঙ্গে আমি হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিয়াছি, তুমি যাবৎ রাখড়চন্দ্রকে মন্ত্রদানে দীক্ষিত না করিবে, তাবৎ তুমি আমার মূর্ত্তি দর্শনে সমর্থ হইবে না।"

সন্ন্যাসীর তন্দ্রা দূরে গেল। অজ্ঞানতা হেতু তিনি যে মহা-ভ্রমের কার্য্য করিয়াছেন, তাহা স্মৃতিপথে জাগরূক হইয়া তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি মন্দির ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া রাজা রাখড়চন্দ্রের অনুসন্ধানে গমন করিলেন। কিছুদিন মধ্যেই রাখড়চন্দ্রের গৃহে সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন, বৎস ! তোমার ন্যায় মহাপুরুষকে যে দীক্ষা দিবে, তাহার জীবন ধন্য, বহু তপস্যা ব্যতীত তোমাকে শিষ্য-লাভ মানব-ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ করিয়া আমি যে মহাপাপের কার্য্য করিয়াছি, তাহার গুরুদণ্ডে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তুমি তোমার স্বভাব সুলভ ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ কর এবং আমাকে ঘোর সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া ধন্য কর। সন্ন্যাসী যাবতীয় বিবরণ রাজা রাখড়চন্দ্রকে যথাযথরূপে জ্ঞাত করিলেন এবং অগৌণে তাঁহাকে মন্ত্র-প্রদানে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় শ্রীধাম অভিমুখে গমন করিলেন। গন্তব্য-পথে সন্ন্যাসীর কোন বাধা-বিঘ্ন ঘটিল না, পথক্লেশে, সন্ন্যাসী ক্লান্ত হইলেন না, নির্দ্দিষ্টকালে পুনরায় মহাপ্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, প্রভু-দর্শনে সন্ন্যাসীর আর কোন অন্তরায় উপস্থিত হইল না। তিনি প্রাণভরিয়া প্রভুর দিব্য শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন; তাঁহার হৃদয়

আনন্দে ভরিয়া গেল, দেহ পবিত্র হইল এবং নয়ন স্বার্থক হইল।

দীক্ষিত হইয়া রাখড়চন্দ্র সংসার-বন্ধন ক্রমেই অধিক-তররূপে শিথিল করিতে লাগিলেন এবং দিবস-যামিনী নিভৃতে নির্জ্জনে ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে ভগবদুপাসনায় ডুবিয়া রহিলেন। রাখড়চন্দ্রের সাধ্বী পত্নী তাঁহারই ন্যায় পুণ্যশীলা, দয়াবতী ও উদারহৃদয়া ছিলেন। পতিগতপ্রাণা সতী স্বামীর সকল কার্য্যেই অকপটে যোগদান করিয়া যথার্থ সহধর্ম্মিণীর পরিচয় প্রদান করিতেন। রাজরাণী হইয়াও তিনি অতিথি-অভ্যাগতকে স্বহস্তে সেবা করিতেন, বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, দীনহীন দরিদ্রের অভাব-মোচনে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার অপার করুণায় রাজধানীর কোন অধিবাসীই দারিদ্র্যদুঃখ অনুভব করিবার অবসর পাইত না। পুণ্যবতীর ব্রত-কর্ম্মের সংখ্যাধিক্যে পল্লীর ব্রাহ্মণপত্নী ও অবিবাহিতা বালিকাগণের বস্ত্রাভরণ ক্রয় করিবার আবশ্যকতা হইত না। তিনি স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া একটী শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট্ আলাউদ্দিন রাজা বাজবসন্তকে যে ভাস্কর দান করিয়াছিলেন, সেই ভাস্করের বংশধরেরা এই শিবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মলুটীতে শতাধিক শিবমন্দির আছে, কিন্তু এই মন্দিরটীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। মন্দিরটীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইতে তিন বৎসর সময়

লাগিয়াছিল। এখনও মন্দিরটী অক্ষত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দিরের সমগ্র সম্মুখভাগ প্রস্তরসংযুক্ত এবং এই সকল প্রস্তরে হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত। মন্দিরের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখিয়া দর্শককে বিস্মিত ও বিমোহিত হইতে হয়। তৎকালে অন্য যে কোন দ্রব্য সহজলভ্য ছিল এবং সকল দ্রব্যই প্রচুরভাবে ও সুলভে পাওয়া যাইত; কেবলমাত্র মুদ্রা দেবদুর্ল্লভ বলিয়া সকলেই জ্ঞান করিত, বহুকষ্টে লোক একটী মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারিত। উক্ত মন্দিরটীর সম্পূর্ণ নির্ম্মাণ-কার্য্যে তৎকালের ঐরূপ দেবদুর্ল্লভ মুদ্রার আট সহস্র ব্যয়িত হইয়াছিল।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা শেষ করিয়া এই মহিয়সী রমণী একটী সুবৃহৎ জলাশয় খনন করাইবার সংকল্প করিলেন। সংসার-ধর্ম্মে উদাসীন রাজার কোন বিষয়েই আপত্তি ছিল না অধিকন্তু এই সকল সদনুষ্ঠান তাঁহার অধিকতর প্রিয় ছিল। মলুটী হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী নিরিসা গ্রামে পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা হইল। পুষ্করিণী ৫ হাত পরিমিত খনিত হইলে একটী মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, কর্ম্মচারি-গণ খনন বন্ধ রাখিয়া এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করিলেন। ধর্ম্ম-প্রিয় রাজা কোন দেবমন্দিরের আবিষ্কার সম্ভাবনা বোধ করিয়া স্বয়ং নিরিসা গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং খননযন্ত্রের আঘাতে মন্দিরের কোন অংশ ভগ্ন বা ক্ষত যাহাতে না হয়,

তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া, পুনরায় খননের আদেশ প্রদান করিলেন। অত্যল্প দিনমধ্যেই মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা রাশি অপসারিত হইলে, তৎসংবাদ রাজাকে প্রদত্ত হইল। রাখড়চন্দ্র পুনরায় নিরিসায় উপস্থিত হইলেন এবং মন্দিরের সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, মন্দিরদ্বার লৌহময় কপাটে আবদ্ধ। ভৃত্যবর্গকে দ্বারোদ্ঘাটনের আদেশ দিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই সেই বদ্ধ-দ্বার উন্মোচনে সমর্থ হইল না। রাখড়চন্দ্রের কৌতূহল সমধিক বৃদ্ধি হইল। তিনি স্বয়ং অগ্রসর হইয়া কপাটগাত্রে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার করস্পর্শমাত্র সশব্দে কপাট খুলিয়া গেল। রাখড়চন্দ্র দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, মন্দিরমধ্যে এক দীর্ঘকায় আজানুলম্বিতবাহু পরমসুন্দর মহাপুরুষ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন। মহাপুরুষ জীবিত কি মৃত, রাখড়চন্দ্র তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল, অগ্রে এই সর্ব্বজনপ্রণম্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে প্রণাম করিয়া জীবন সার্থক করি। তৎক্ষণাৎ তিনি ভক্তিভরে মহাপুরুষের চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। মন্দিরে কোন দেবতা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য রাখড়চন্দ্র তুলসী পত্র ও গঙ্গাজল সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। রাখড়চন্দ্রের হস্তস্পর্শে মহাপুরুষ

চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং জলদগম্ভীরস্বরে রাখড়চন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন, তোমার হস্তে ঐ সকল কোন্ দ্রব্য রহিয়াছে ? রাখড়চন্দ্র কহিলেন, ইহা তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল। এই কথা শুনিয়া মহাপুরুষ পুলকিতদেহে হর্ষোৎফুল্লনয়নে পুনরায় কহিলেন, তুলসীপত্রের আকার ও গঙ্গাজলের বর্ণ দেখিয়া আমার মনে হইতেছে, এক্ষণে কলিযুগ উপস্থিত, এবং তুমি রাজা রাখড়চন্দ্র। রাখড়চন্দ্র বলিলেন, আপনার অনুমান সম্পূর্ণ সত্য, আপনি যদি দয়া করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন, তাহা হইলে ধন্য ও কৃতার্থ হই। কি করিয়াই বা আপনি এই অধমের নাম অবগত হইলেন, তাহা জানিবার জন্য অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি। রাখড়চন্দ্রের এই আবেগপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে মহাপুরুষ কহিতে লাগিলেন, দ্বাপরযুগের মধ্যকালে আমি কোন বিশাল ভূভাগের অধীশ্বর ছিলাম। মোহবশে আমি রাজোচিত কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া রমণীমণ্ডলে পরিবেষ্টিত রহিতাম এবং উদ্দাম যৌবনের পশূচিত বৃত্তিসমূহের চরিতার্থতা সাধন করিয়া আমোদ-আহ্লাদে দিন অতিবাহিত করিতাম। কেবলমাত্র মৃগয়া আমার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদা আমি মৃগয়া হেতু অশ্বারোহণে একাকী রাজপুরী হইতে বহির্গত হইয়া সমস্তদিন অনশনে পর্য্যটন করিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে এইস্থানের গভীর

অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বর্ষাকাল, সহসা এই সময়ে আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল, চতুর্দ্দিক্ ঘোর তিমিরাবৃত হওয়ায় সম্মুখস্থ পদার্থনিচয়ও দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎপ্রভায় বনভূমি ক্ষণকালের জন্য আলোকিত হইতেছিল। এইরূপ ঘোরসঙ্কটে পতিত হইয়া আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। সাহসভরে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। এই সময়ে বিদ্যুতালোকে অদূরে এই মন্দির আমার দৃষ্টিগোচর হইল। মন্দির দেখিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার হইল এবং তন্মুহূর্ত্তে অশ্ব ত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে মন্দির উদ্দেশে গমন করিলাম। মন্দিরদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলাম, দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তখন আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, আমি বিপন্ন পথিক; সমস্তদিন অনাহারে আমার দেহ অতিমাত্র ক্লান্ত। এইক্ষণেই অবিশ্রান্তধারায় বৃষ্টি পতিত হইবে। মন্দির-অভ্যন্তরে কে আছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে আশ্রয়দানে আমার জীবন রক্ষা করুন। পুনঃ পুনঃ আমার করুণ প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করিল না। মন্দির-স্বামীর এই আচরণে আমার ভীষণ ক্রোধের সঞ্চার হইল এবং আমি অনন্যোপায় ও ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া সবলে মন্দিরদ্বারে পদাঘাত করিলাম। আমার ভীম পদাঘাতে মন্দির-কপাট ভগ্ন হইয়া গেল এবং সেই ভগ্ন কপাট মন্দিরের মধ্যস্থলে

উপবিষ্ট এক মনুষ্যদেহের মস্তকে পতিত হইল। কপাটের আঘাতে উপবিষ্ট ব্যক্তির মস্তকের স্থান-বিশেষ কর্ত্তিত হইয়া, ক্ষতস্থান হইতে বেগেরুধির ধারা পতিত হইতে লাগিল। উপবিষ্ট ব্যক্তি জনৈক ভগবদ্ভক্ত মহাতাপস। গভীর অরণ্যের নির্জ্জন স্থানে এই মন্দিরে তিনি ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। মস্তিকের কঠিন আঘাতে যোগিবরের তপঃভঙ্গ হইলে তিনি যোগবলে সমুদয় জ্ঞাত হইলেন এবং ক্রোধভরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, পামর! দুরাচার! তাপসগণের ভগবদারাধনায় যাহাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে. তাহারই ব্যবস্থা করা তোমার কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। সে কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়া—সে ধর্ম্ম পদদলিত করিয়া অন্তঃপুরে রমণীমণ্ডলে আমোদ-প্রমোদে দিন অতিবাহিত করিয়া থাক। এক্ষণে নিরপরাধে আমার তপঃভঙ্গ করিয়া আমাকে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিলে; তোমার আগমনে এবং তোমার পদস্পর্শে আবার এই পবিত্র মন্দির অপবিত্র হইয়াছে ; এই ভূমি আমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতেছি। তুমি এই মন্দিরে লৌহময় কপাটে আবদ্ধ হইয়া জীবিতাবস্থায় যুগযুগান্তব্যাপী নরকযন্ত্রণা ভোগ কর। তাপসবরের এই ভীষণ অভিশাপে আমার প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠিল। তাপস বর গমনোদ্যত হইলে আমি তাঁহার চরণমূলে পতিত হইয়া কহিলাম, প্রভু, আমি অজ্ঞানতা হেতু যে মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি,

আপনি তাহার প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। আপনার প্রদত্ত দণ্ড গ্রহণ না করিলে আমার চিরনরক বাসের পথ প্রতিরোধের দ্বিতীয় উপায় নাই। আপনি ক্ষমাশীল মহাতেজা ব্রাহ্মণ, দয়া করিয়া আমার দণ্ড-ভোগের কাল নির্দ্ধারণ এবং ভোগ শেষে মুক্তির উপায় বিধান করিয়া নরাধমকে উদ্ধার করুন। আমার এই করুণ প্রার্থনায় তাপসের দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি কহিলেন, কলিযুগে রাজা বাজবসন্তের বংশে রাখড়চন্দ্র নামক জনৈক পরমধার্ম্মিক মহা-পুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার অঙ্গস্পর্শে তুমি পাপ মুক্ত হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এই মন্দিরের এই লৌহময় কপাট তোমার স্পর্শ ব্যতীত কোন প্রকারেই উদ্ঘাটিত হইত না, তাহাতেই বুঝিয়াছি, তুমিই সেই রাজা রাখড়চন্দ্র। আজ আমার বড় শুভদিন, তোমার পবিত্র অঙ্গস্পর্শে আমি শাপবিমুক্ত হইলাম। আমার বরে আর তোমার মনুষ্য জন্ম হইবে না, মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিয়া তুমি অক্ষয় স্বর্গে বাস করিবে। এক্ষণে অবিলম্বে তুমি এই স্থান ত্যাগ কর এবং মন্দির মৃত্তিকাচ্ছাদিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। তোমার বংশে এই স্থান যেন কেহ কখনও খনন না করে। এখনও নিরিসা গ্রামে এই পুষ্করিণী অর্দ্ধখননাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং এক্ষণে ইহা এদেশে "আধখোঁড়া পুকুর" নামে খ্যাত। রাখড়চন্দ্র মহাপুরুষের আদেশ অনুসারে

অবিলম্বে মন্দির মৃত্তিকাচ্ছাদিত করাইয়া গৃহপ্রত্যাগত হইলেন।

যে সময়ের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইতেছে, তৎকালে রাখড়-চন্দ্রের দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠের নাম আনন্দচন্দ্র ও কনিষ্ঠের নাম প্রাণনাথ। মন্দির-সংক্রান্ত ঘটনার পর হইতে রাখড়চন্দ্র বৈষয়িক-কার্য্যে এবং পারিবারিক প্রীতি-সম্ভোগে সম্পূর্ণভাবে নিলিপ্ত হইয়া পড়িলেন। নিভৃতে ভগবানের নামকীর্ত্তনে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এইভাবে কিছুদিন গত হইলে একদিন রাখড়চন্দ্র পত্নীকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এইবার আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে, আমি পুণ্যধাম জগন্নাথ-ক্ষেত্রে গমন করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে দেহরক্ষা করিব। স্বামীর এই নিদারুণ-বাক্যে পতিপ্রাণা সতীর দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, তিনি অতিমাত্র ব্যাকুলা ও কাতরা হইয়া পড়িলেন। সতী স্বামীর সহগামিনী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাখড়চন্দ্র সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সতী কহিলেন, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না; আপনি দয়া করিয়া আমার একটী মাত্র শেষ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আপনি গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া আমার নিকটে আগামী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করুন। পত্নীর এই অনুরোধ উপেক্ষিত হইল না, রাখড়চন্দ্র ঐ সময়

পর্য্যন্ত গৃহবাসে সম্মতি দান করিলেন। ক্রমেই পূর্ণিমা আসিয়া পড়িল। পূর্ণিমার দিন সতী অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া স্নান করিলেন এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবালয় সমূহে দেবমূর্ত্তিদর্শন, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। তৎপরে গৃহস্থিত তুলসীমন্দিরের নীচে আসন গ্রহণ করিয়া দাসীকে স্বামী ও পুত্রদ্বয়কে লইয়া আসিতে বলিলেন। ক্ষণপরেই রাখড়চন্দ্র পুত্রদ্বয় সমভিব্যহারে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সতীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন, তিনি যেন কোথাও যাইবার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছেন। রাখড়চন্দ্র উপস্থিত হইবামাত্র সতী ভক্তিভরে পতিদেবতার চরণে প্রণতা হইলেন এবং করযোড়ে কহিলেন, আমি স্বামী-শূন্য শ্মশানবৎ গৃহে একদিনও বাস করিতে পারিব না। দয়া করিয়া আজ আমার চিরদিনের সাধ পূর্ণ করুন। আমি এই তুলসীমূলে শয়ন করি, আপনি আমার মস্তকে পদদান করিয়া শিয়রে উপবেশন করুন; আর আমার জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্দচন্দ্র আমার কর্ণকুহরে উচ্চৈঃস্বরে জগজ্জননী চিন্ময়ীর মধুময় নাম শুনাইতে থাকুন। রাখড়চন্দ্র পত্নীর অন্তিম প্রার্থনা অবিলম্বে পূর্ণ করিলেন। পল্লীতে এই সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা যে যেখানে ছিল, সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রাজভবনে ছুটিয়া আসিল। মুহূর্ত্তমধ্যে এত অধিক লোক সমাগম হইল যে, বিশাল

অঙ্গনে তিল-ধারণের স্থান রহিল না। পতিচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া, পুত্রমুখে মোক্ষদায়িনী শ্রীদুর্গার পবিত্র নাম শুনিতে শুনিতে অল্পক্ষণ পরেই সতী দেহত্যাগ করিলেন। স্বর্গচ্যুতা শাপভ্রষ্টা দেবী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সতীর এইরূপ অলৌকিকভাবে দেহত্যাগে ধন্য ধন্য রব উঠিতে লাগিল, রমণীগণ সতীর চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ করিলেন। সতীর মহাপ্রয়াণে কেবলমাত্র আনন্দচন্দ্র ও প্রাণনাথ জননী-স্নেহে বঞ্চিত হইলেন না, পল্লীর দীন দুঃখী কাঙ্গালেরা আজ মাতৃহারা হইল। দাসদাসীরা ভূমে গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

রাজভবনের উত্তরদিকে যে ক্ষুদ্র নদী আছে, সেই নদীগর্ভে সতীদেহ নীত হইল। গ্রামবাসী শত সহস্র ব্যক্তি শবানুগমন করিল। ঘৃতাক্ত চন্দনকাষ্ঠে শব-দাহন শেষ হইলে শ্মশানভূমে শবদগ্ধ ভস্মরাশির চিহ্নমাত্র রহিল না। পল্লীর রমণীগণ তাহা পবিত্রবোধে সংগ্রহ করিয়া যত্ন-সহকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। নদীর যে স্থানে সতীদেহের দাহন হইল, সেই স্থানই অতঃপর গ্রামের শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইল। এ দেশের সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের শবদাহ সাধারণতঃ তারাপুরের মহাশ্মশানে অথবা গঙ্গাতীরে হইয়া থাকে, কিন্তু মলুটীর রাজপরিবারবর্গের অথবা সাধারণ অধিবাসিসমূহের মৃতদেহ গঙ্গাতীরে প্রেরণ আবশ্যক

হয় না, তাঁহারা উক্ত শ্মশানক্ষেত্রকেই গঙ্গাতীর তুল্য পবিত্র মনে করিয়া থাকেন। এই পুণ্যপ্রদ শ্মশান আজও "সতীঘাট" নামে খ্যাত হইয়া রাখড়চন্দ্রের দেবীরূপা পত্নীর মধুময় স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

যথাসময়ে রাখড়চন্দ্র পত্নীর মহাসমারোহে পুত্রদ্বয়ের দ্বারা "চন্দনধেনু" শ্রাদ্ধকর্ম্ম করাইয়া জগন্নাথধামে গমন জন্য সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং একাকী পদব্রজে শ্রীধামে রওনা হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্মের জন্য কি অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার! মনোরম শিবিকা ব্যতীত যিনি অর্দ্ধক্রোশ পথও অতিক্রম করিতেন না, সেবাভিলাষী হইয়া দাস দাসী ও দেহরক্ষার জন্য সশস্ত্র প্রহরী সর্ব্বত্র যাঁহার অনুগমন করিত, সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি প্রাণাধিক পুত্র, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের মায়া কাটাইয়া বিপুল ধন সম্পদ ও স্বর্গসম রাজপুরী অবিকৃতচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া আজ একাকী পদব্রজে সহস্র ক্রোশ দূরে প্রয়াণ করিলেন। এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব দৃশ্যের অপরূপ আলেখ্য দর্শন একমাত্র মুনি-ঋষি-অধ্যুষিত ভারতবর্ষেই সম্ভব হয়। এখানে ভোগাসক্তির প্রবল প্রতাপ এইরূপে ত্যাগের দ্বারাই খর্ব্বীভূত হইয়া থাকে।

শ্রীক্ষেত্র গমনের পথে রাখড়চন্দ্র একস্থানে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। জ্বরবেগ এত অধিক হইয়াছিল

যে, চারিদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না। পথক্লেশ, অর্দ্ধাশন, রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি অত্যাচারে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। আর এক স্থানে তিনি দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন, দস্যুগণ তাঁহাকে অর্থশূন্য দেখিয়া বিনা অত্যাচারেই পরিত্যাগ করিয়াছিল। এইরূপে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া, বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি পুরীধামে পঁহুছিয়াছিলেন। রাখড়চন্দ্র মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলে মলুটী-রাজপরিবারের নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রাখড়চন্দ্র পাণ্ডাকে পথের বিবরণ গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীধামে আগমনের উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তৎপরে রাখড়চন্দ্র মন্দিরাভ্যন্তরে গমনোদ্যত হইলে, অপরাপর পাণ্ডারা তাঁহার মলিনবসন ও জীর্ণশীর্ণ রুগ্নদেহ দেখিয়া তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিন দিন কাল তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও প্রবেশলাভে কৃতকার্য্য হইলেন না। এইরূপে তিনি হতাশ হইয়া তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যাকালে বাহিরে আসিলেন এবং মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরপ্রাণে মহাপ্রভুকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তাধীন প্রভু আর ভক্তের কষ্টে স্থির রহিতে পারিলেন না। রাখড়চন্দ্র যেস্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন, সহসা সেই স্থানে তিনি প্রবেশের পরিমিত স্থান উন্মুক্ত দেখিয়া সেই পথে মন্দির

মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক রাখড়চন্দ্র জগন্নাথদেবের পদতলে শয়ন করিয়া মহাপ্রভুর স্বরূপ চিন্তায় আত্মহারা হইলেন এবং শ্রীমুর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে পঞ্চত্ব লাভ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পাণ্ডাগণ দেখিলেন, যাঁহার মলিন বেশভূষা ও ক্ষীণ দেহ দেখিয়া তাঁহারা যাঁহাকে বলপ্রকাশে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তিনিই প্রভুর পদতলে দেহরক্ষা করিয়াছেন। এই সময়ে রাখড়চন্দ্রের পরিচিত পাণ্ডা অপর সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডাগণ পরিচয় জ্ঞাত হইয়া অতিমাত্র অনুতপ্ত হইলেন এবং সকলে একত্র হইয়া রাখড়চন্দ্রের শবদেহ মহা-সমাদরে মন্দিরের এক অংশে প্রোথিত করিলেন। প্রথম সাক্ষাৎকালে রাখড়চন্দ্র তাঁহার কোনপ্রকার পরিচয় প্রদান করিতে তাঁহার পাণ্ডাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সেই পাণ্ডা মলুটীতে আসিলে আনন্দচন্দ্র ও প্রাণনাথ পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ-সংবাদ জ্ঞাত হয়েন।

মলুটীর দক্ষিণপ্রান্তে রাজবংশীয়দিগের কুলদেবতা মৌলিক্ষাদেবীর মন্দির আছে, এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে রাখড়চন্দ্র তাঁহার মাতৃদেবীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া দুইটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দির দুইটীর একটী এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মন্দির-মধ্যস্থিত শিবমূর্ত্তি "বর্গীর হাঙ্গামা"-কালে দস্যুগণ কর্ত্তৃক নষ্ট ও স্থানান্তরে অপসারিত

হইয়াছিল। মন্দিরগাত্রে মন্দিরনির্ম্মাণের সময় প্রস্তর-ফলকে খোদিত রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, কিঞ্চিদূ্যন ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রাখড়চন্দ্রের এই রাজবংশে আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এতদ্দেশের কত রাজ্যের ও কত রাজার অভ্যুত্থান ও পতন সংসাধিত হইয়াছে, কিন্তু রাখড়চন্দ্রের পুণ্যফলে মলুটী-রাজবংশ আজও পুণ্যকীর্ত্তি সমূহের অধিকাংশই বক্ষে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। রাখড়চন্দ্র স্বনামধন্য মহাপুরুষ, তিনি নরাকারে দেবতা ছিলেন, সংসারে তাঁহার মনোরমা গুণবতী ভার্য্যা ছিল, বংশোজ্জ্বল পুত্র ছিল, কুবের তুল্য ধন-সম্পদ ছিল, কিন্তু তিনি ভোগাসক্তি পরিহার করিয়া সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত ছিলেন। এই শাপভ্রষ্ট দেবতা মলুটী রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশকে চিরপবিত্র, চির-উজ্জ্বল ও ধন্য করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনায় রাখড়চন্দ্র আড়ম্বর-প্রিয়তার পরিচয় দেন নাই, গৈরিকবসনধারী হয়েন নাই, অথবা জটা, তিলক, মাল্য গ্রহণ করেন নাই, রাজ্যেশ্বর রাজা হইয়াও দীনভাবে, কাঙ্গালের বেশে অস্পৃয়াশূন্যহৃদয়ে ভগবদ্-প্রেমে ডুবিয়া রহিতেন। এমন নিষ্কাম, নির্লোভ, বাসনারহিত, ভাবনাবর্জ্জিত মহাপুরুষ এ যুগে জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এমন প্রসন্নচিত্ত, নিরহঙ্কার, শান্ত-সংযত, দয়ালু, উদার, মহানুভব ব্যক্তি

তৎকালে এ প্রদেশে দ্বিতীয় ছিল না। তিনি কত অনাথ অসহায়ের পিতামাতা ছিলেন, কত দুঃখী কাঙ্গালেদের সর্ব্বস্ব ছিলেন, কত পাপী তাপীর সান্ত্বনাস্বরূপ ছিলেন। রাখড়চন্দ্র একাধারে জ্ঞানের ও প্রেমের অবতার ছিলেন, এই প্রদেশে এমন অতুল চরিত্র মহামহিমান্বিত গৃহযোগীর আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া এদেশ ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিল। আমরা আজ এই নর-দেবতার গুণগাথা কিঞ্চিন্মাত্র বিবৃত করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছি, দেহ মন পবিত্র, আত্মা শুদ্ধ ও জীবন ধন্য হইতেছে।

রাজা আনন্দচন্দ্র

রাখড়চন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দ-চন্দ্র রাজা উপাধি ও রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। আনন্দচন্দ্র পিতৃতুল্য গুণসম্পন্ন না হইলেও বহুসদ্‌গুণের আধার ছিলেন। সংসারবিরাগী রাখড়চন্দ্রের উদাসীনতায় বৈষয়িক কার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইয়াছিল। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই আনন্দচন্দ্র এই সমুদায় বিশৃঙ্খলা নিরাকরণে হস্তক্ষেপ করেন। এই সময়ে অংশিগণের বাহুল্য হেতু পরস্পরের মধ্যে অধিকৃত সম্পত্তির সীমানা সরহদ্দ লইয়া

নানা গোলযোগ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছিল। প্রজাগণের জমি জমার বিবরণসূচক উপযুক্ত কাগজ-পত্র ছিল না। আনন্দচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমে অপর তিন "তরফের" প্রধান তিন জনকে সঙ্গে লইয়া কর্ম্মচারীর সাহায্যে সমগ্র মহলের জরীপ জমাবন্দির ব্যবস্থা করেন এবং তরফ অনুসারে বিভক্ত সম্পত্তির সীমা নির্দ্দেশ করিয়া প্রজা ও তাহার অধিকৃত জমি জমা নির্দ্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। তৎপরে তদনুসারে বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে পরস্পরের স্বাক্ষর করাইয়া তরফের প্রধান ব্যক্তির নিকট তাহা রক্ষিত হইবার সুব্যবস্থা করেন। এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে কি বর্ত্তমানে অথবা দূর ভবিষ্যতে কাহারও সহিত কাহারও কোনপ্রকার অসদ্ভাব ঘটিবার কারণ রহিল না এবং সম্পত্তির আয়ও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। সহকারী অংশিগণ আনন্দচন্দ্রের নিরপেক্ষতায় পরম সন্তুষ্ট হইলেন। রাখড়চন্দ্র যৎকালে বৈষয়িক সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ধ্যান-ধারণায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে ব্রহ্মচারীর শাপে রামচন্দ্রের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল এবং তাঁহার একমাত্র নাবালক শিশুপুত্র তখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই, মহাদেবও এই সময়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন, এই সুযোগে আলিলকির বংশধরেরা তাঁহাদের সম্পত্তির সংলগ্ন রাজবংশীয়দিগের কিয়দংশ সম্পত্তি পুনরধিকার করেন।

মোগল সম্রাটগণের রাজত্বের শেষাবস্থায় দেশের সর্ব্বত্র ব্যবস্থিত সুশাসন শিথিল হইয়াছিল ; তখন "জোর যার মুলুক তার" এই নীতিই অনুসৃত হইত। এই হেতু ভূস্বামিগণের মধ্যে যখন যাঁহার শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিক হইত, তিনি তখন পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামিগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতেন। এই কারণেই আলিলকী বহু নিরীহ ভূস্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন এবং কাপুরুষের ন্যায় অতর্কিত গুপ্ত-আক্রমণে কত বড় বড় লোকের জীবন নষ্ট করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্রের রাজ্যগ্রহণের প্রথমভাগে আলিলকীর উত্তরাধিকারীরা যখন মলুটীরাজের কিয়দংশ সম্পত্তি পুনরধিকার করেন, তখন আর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবার দিন অথবা পরস্পরের সে প্রকার শক্তিসামর্থ্য ছিল না। এই সময়ে বঙ্গদেশ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের যিনি সুবেদার নিযুক্ত হয়েন, মুর্শিদাবাদে তিনি সদরকাছারী করিয়াছিলেন। আনন্দচন্দ্র মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া আলিলকীর উত্তরাধিকারিগণের বিরুদ্ধে সুবেদারের নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করিলে, সুবেদার তাঁহাদিগকে সদর কাছারীতে আহ্বান করেন এবং উভয়পক্ষের সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করিয়া দলিল দস্তাবেজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করেন। বাদসাহ-প্রদত্ত দলিলে বিরোধী সম্পত্তি মলুটী-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত

হয় এবং সুবেদারের আদেশে আলিলকীর উত্তরাধিকারীরা সেই সকল সম্পত্তি উপযুক্তরূপ ক্ষতিপূরণ সহ প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন। আনন্দচন্দ্রের এইরূপ কর্ম্মপটুতা ও কৃতিত্বে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আনন্দচন্দ্রের কৃতিত্ব বৈষয়িক সর্ব্বাঙ্গীন সুশৃঙ্খলা-সাধনেই পর্য্যবসিত হয় নাই, তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও কর্ম্মবীর; যখন দেখিলেন, অচিরে দারুণ গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইবে এবং তাহার ফলে তাঁহাদের পতন ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তখন সর্ব্বাগ্রে সেই বিরোধ নিরাকরণের সুপন্থা অবলম্বন করিয়া আপনাদিগের মধ্যে সুদৃঢ় একতা স্থাপন করিলেন। বৈধ উপায়ে অধিকারচ্যুত সম্পত্তির উদ্ধার সাধন করিলেন। এইরূপে সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ হইয়া তিনি ভাবিলেন, কেবলমাত্র আত্ম পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান ও বৈষয়িক উন্নতি সাধন করিলেই মানুষের প্রকৃত কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না। ভগবৎপ্রদত্ত শক্তি-সামর্থ্যের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করিলে প্রত্যবায় আছে এবং প্রত্যেক মানবই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে নৈতিক নিয়মে বাধ্য। এইরূপ সৎচিন্তার পরিণতি তাঁহাকে নানা সদনুষ্ঠানে নিরত করিল। তিনি অগ্রণী ও কর্ণধাররূপে যে সমুদয় পুণ্যকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইব।

আনন্দচন্দ্রের প্রথম কীর্ত্তি—“ব্রাহ্মণ-বিদায়”। তৎকালে বর্ত্তমান যুগের ন্যায় জনসাধারণকে শিক্ষিত করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পদ্ধতি ছিল না। সাধারণতঃ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কাণ্ড করিবার জন্য উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন এবং তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়া যজন যাজন ও অধ্যাপনায় ব্রতী হইতেন। অনেকে নিজ গৃহে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপকরূপে বিদ্যার্থি-গণকে বিদ্যাদান করিতেন এবং এই সকল বিদ্যার্থীরাও অধ্যাপকগৃহেই আহারাদি করিতেন। অধ্যাপকদিগের আর্থিক সামর্থ্য বা কোনপ্রকার বিশিষ্ট আয় কিছুমাত্র ছিল না। এ দেশের যে যে স্থানে এইরূপ চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার অধ্যাপকগণকে আনন্দচন্দ্র সসম্মানে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের চতুষ্পাঠীর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ জ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে সেই ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করিলেন। বহু অধ্যাপকের বংশধরেরা রাজবংশ হইতে প্রাপ্ত সেই নিষ্কর ভূমি আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া স্বচ্ছন্দে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেছেন। এই ভাবে শাস্ত্র শিক্ষার উৎসাহ দেওয়ায় সনাতনধর্ম্মী হিন্দুসমাজের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। রাজবাড়ীতে বিবিধ দায়ে বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় সর্ব্বদাই আগমন করিত কিন্তু

তাহাদিগকে সাহায্য করিবার কোন স্থায়ী ব্যবস্থা ছিল না, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যাত হইয়া হতাশচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এই আশঙ্কায় আনন্দচন্দ্র একটী সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন করিলেন। সদ্বংশজাত অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণ, পিতৃমাতৃ ও কন্যাদায়ে বিপন্ন ব্যক্তি, সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, সংসারবিরাগী যোগী, সন্ন্যাসী এবং কোনপ্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী হইয়া রাজবাড়ীতে আগমন করিলে তাঁহাদিগকে গুণানুসারে এই সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে বৃত্তি ও সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হইল। শারদীয়া পূজার দুই মাস পূর্ব্ব হইতে বৃত্তি প্রদান আরম্ভ হইয়া নবম্যাদি কল্পের দিনে সেই দানের পরিসমাপ্তির ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে যিনি যে পরিমাণ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে তিনি চিরকালই সেই পরিমাণে বৃত্তি পাইতে থাকেন। এই দান এখানে "ব্রাহ্মণ-বিদায়" নামে অভিহিত এবং একাল পর্য্যন্ত তাহা প্রায় পূর্ব্ববৎ ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। একমাত্র আনন্দচন্দ্রের অর্থে এই ব্রাহ্মণ-বিদায় প্রথা স্থাপিত হয় নাই। আনন্দচন্দ্র প্রস্তাবক, প্রবর্ত্তক এবং তাঁহার চেষ্টা-যত্নেই ইহার কলেবর গঠিত হইয়াছিল। ইনি তাঁহার সকল সহকারী অংশীদারকে এই মহনীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন এবং কোন অংশীদারই যাহাতে ইহার শুভময় ফলের সৌভাগ্য লাভে

বঞ্চিত না হয়েন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, সকলেই আনন্দচন্দ্রের প্রস্তাব সাদরে অনুমোদন করিয়া তাহাতে যোগদান করেন। এই ব্রাহ্মণ-বিদায়ে মোট যত টাকা ব্যয় হইবে, রাজার তরফ ও মধ্যম তরফ তাহার দশ আনা অংশ এবং দুই সিকির তরফ ছয় আনা অংশ দিবেন, আনন্দচন্দ্র তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দেন। আনন্দচন্দ্রের নির্দ্দেশ এক্ষণেও অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রহিয়াছে। 'ব্রাহ্মণ-বিদায়' মলুটী রাজবংশের একটী অত্যুজ্জ্বল মহাকীর্ত্তি। আজও এই মহাকীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়া রাজবংশীয়দিগকে গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। শারদীয়া পূজার দুইমাস পূর্ব্ব হইতে বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ সকলের শুভাগমন হইতে থাকে, কত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কত আচারবান্ অধ্যাপকমণ্ডলী, মলুটীতে পদধূলি দিয়া পল্লী পবিত্র করেন, কত সুকণ্ঠ গায়ক, কত অনুকৃতি-রঙ্গপটু রসিক সুজন, স্ব স্ব গুণপরিচয়ে দুই মাস কাল গ্রামের গগন পবন মুখরিত করিয়া রাখেন, কত বিপন্ন বিব্রত ব্যক্তি, কত দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র, কত পিতৃমাতৃ ও কন্যাদায়গ্রস্ত জনসমূহ অভাবমুক্ত হইয়া দাতাদিগকে দুই হাত তুলিয়া প্রাণের অকপট আশীর্ব্বাদ দিয়া যান। যে কোন ব্যক্তি যে কোন ভাবে আসিয়া সাহায্যপ্রার্থী হয়েন, কেহই প্রত্যাখ্যাত হয়েন না। দানের আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, সাহায্য-

প্রার্থীরা সমাদরে গৃহীত হয়েন এবং একবার যিনি সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার বংশাবলী চিরকালই পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রথম দানগৃহীতার গুণ-বিশেষের উপর সাহায্যের পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে, কিন্তু গ্রহীতার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা তাদৃশ গুণবিশিষ্ট না হইলেও প্রথমে প্রদত্ত অর্থের যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয়, কখনও তাহার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয় না। বংশধরগণের অনেকেই এক্ষণে হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মণবিদায়ে যাঁহার যাহা দেয়, তিনি তাহা অকুণ্ঠিতচিত্তে দিতে কুণ্ঠিত বা পশ্চাৎপদ হয়েন না। সকলেরই মনের বিশ্বাস, যদি তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের শুভানুষ্ঠানে স্ব স্ব অর্থ প্রদান না করেন, তাহা হইলে সেই মহাকীর্ত্তির লোপ-হেতু দারুণ পাপ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে এবং তাঁহাদের বংশাবলী অন্নবস্ত্রের জন্য লালায়িত হইবে। এই সংস্কার সকলের অন্তঃকরণে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল আছে বলিয়াই, দেশের এই দুর্দ্দিনে এখনও মলুটী-রাজবংশের এই পুণ্যকীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই।

গুণীর সম্মান ঃ—আনন্দচন্দ্র দয়ালু, মধুরভাষী ও পরোপকারী ছিলেন। আপনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল-চিত্ত থাকিতে এবং অপরকে তদ্রূপ দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি পরদুঃখ সহ্য করিতে পারিতেন না, কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে যতক্ষণ

তাহার প্রতিকার করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ তিনি অতিমাত্র অশান্তি ভোগ করিতেন। তিনি অতিথি-সন্ন্যাসী, সাধু-সজ্জন, পণ্ডিতমণ্ডলী ও কোনপ্রকার বিশেষ প্রতিভাশালী ও কলাবিদ্যা নিপুণ ব্যক্তিদিগকে অতি সমাদরের চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাদের অভাব দুঃখ দূরীকরণ হেতু মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। চরিত্র-হীন, অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী ও পরপীড়নকারী ব্যক্তিদিগকে আনন্দচন্দ্র অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং তাহাদের কোনপ্রকার সংস্রবে আসিতেন না। পারিষদগণের মধ্যে ভবানী-মঙ্গল-প্রণেতা গঙ্গানারায়ণ নামক একজন স্বভাবকবি আনন্দচন্দ্রের অতি প্রিয় ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ অতি সুন্দর ভাবপূর্ণ কবিতা ও সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ অধীন কর্ম্ম-চারী হইলেও গুণগ্রাহী আনন্দচন্দ্র তাঁহাকে বন্ধুভাবে সমাদর করিতেন এবং গঙ্গানারায়ণকে অন্য কোন কার্য্য করিতে দিতেন না। মলুটীর অদূরবর্ত্তী হস্তিকান্দা গ্রামে গঙ্গনারায়ণের বাসস্থান ছিল। প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে গঙ্গানারায়ণ হস্তিকান্দা হইতে রাজসভাস্থ হইয়া সন্ধ্যাকালে গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। গঙ্গানারায়ণ মাসিক নির্দ্দিষ্ট বেতনভুক্ হইলেও তাঁহার এবং তাঁহার ভবিষ্যবংশাবলীর সুখস্বচ্ছন্দে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাজা আনন্দচন্দ্র গঙ্গানারায়ণকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া-ছিলেন। আনন্দচন্দ্র অবসরকালে প্রত্যহ গঙ্গানারায়ণের

কবিতা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন ও মুগ্ধ হইতেন। দুঃখের বিষয়, আমরা গঙ্গানারণের কবিতা সমূহের বা সঙ্গীতাবলী সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। লোকের মুখে মুখে যে দুই চার পংক্তি কবিতা ও গান শুনিয়াছি, তাহাতে গঙ্গানারায়ণের অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভার, রচনা-মাধুর্য্যের ও ভাবসম্পদের প্রকট পরিচয়ে মুগ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ও হেতমপুরের মহারাজ-কুমার গঙ্গানারায়ণের কবিতা ও সঙ্গীত-সংগ্রহে বিশেষ চেষ্টা যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের অধ্যবসায়ে যদি সেই লুপ্তরত্নের উদ্ধার ও আবিষ্কার হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডার একটী নূতন বিভবে পূর্ণ হইবে। নিম্নে গঙ্গানারায়ণের একটী কবিতা ও একটী গান আমরা পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

গঙ্গানারায়ণ-রচিত কবিতা।

ত্রিপদী

রাণী কহে কহ গিরি, ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি
কিরূপে করিলা রাসলীলা।
গোপীগণ সঙ্গে মেলি কৌতুকে করেন কেলি
রাস-রঙ্গ কেমনে করিলা॥
গিরি বলে শুন রাণি সুধার সমান বাণী
হরি-লীলা সংসারের সার।
যে কথা শ্রবণ কৈলে মুক্তিপদ পায় ম'লে
হেলে হয় ভবসিন্ধু পার॥

নন্দের নন্দন প্রভু নিরানন্দ নহে কভু
আনন্দ-স্বরূপ ভগবান।
গোপীগণ লয়ে সঙ্গে রাসলীলা কৈলা রঙ্গে
সংসারে বিস্ময় হইল জ্ঞান॥
কার্ত্তিক-পূর্ণিমা নিশি বৃন্দাবন-কুঞ্জে আসি
কৈলা প্রভু মুরলীর ধ্বনি।
ত্রিজগতে জীবমাত্র প্রেমে পুলকিত-গাত্র
ধ্যান-ভঙ্গ হইলা সব মুনি॥
আইস আইস প্রাণরাধে স্মরিয়ে মনের সাধে
প্রাণের অধিক তুমি প্রিয়া।
তুমি মোর চন্দ্রমুখি যাবত না তোমা দেখি
তাবত অস্থিরে থাকে হিয়া॥
প্রেমময়ী তুমি রাই তোমার তুলনা নাই
রমণীগণের শিরোমণি।
তব মনে সুখ মানি আমারে আপন জানি
আইস যদি প্রেম-বিনোদিনী॥
বাঁশী বাজে ঘনে ঘন গৃহে ছিলা গোপীগণ
শুনি সবে হইলা চমকিত।
বংশীবর রব-রূপী হৃদয়ে ভেদিল গোপী
প্রেমভাবে হইল মুর্চ্ছিত॥
নিজ নিজ গৃহমাঝে কেহ ছিল কোন কাজে
হেন কালে শুনে শ্যাম-বেণু।
গোকুল নাগরীগণে অস্থির হইল মনে,
প্রেমেতে পুলক সর্ব্ব তনু॥

কেহ বা রন্ধনে ছিলা কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তিলা
কেহ আধ ললাটে সিন্দুর।
চঞ্চল চিত্তের ভ্রমে আবরণ ব্যতিক্রমে
করে পরে পায়ের নূপূর॥
মনে হইল প্রেম গাঢ় করেব কঙ্কণ তাড়
চড়াইয়া চরণ উপরে।
অন্য অলঙ্কার যত পরিছে বেসুর মত
বিভুল হইয়া প্রেমভরে॥
সবে বলে সাজ সাজ ভেটিব নাগর-রাজ
ব্যাজ কাজ রাখ সখি দূরে।
শুনিয়া সুন্দরি রাধে সাজিয়া মনের সাধে
অগ্রগতি হইলা সত্বরে॥
এক গোপী ছিল ঘরে চঞ্চল দেখিয়া তারে
পতি তার ধরিয়া রাখিল।
যাইতে না পেয়ে গোপী কৃষ্ণমন্ত্র হৃদে জপি
ধ্যান করি জীবন ত্যজিল॥
অন্তর-যামিন্ হরি তাহারে করুণা করি
দিল গতি জীবের দুর্লভ।
দ্বিজ গঙ্গা নারায়ণে নবীন সঙ্গীত ভণে
মনে ভাবি শ্রীরাধাবল্লভ॥

———

গঙ্গানারায়ণ-রচিত গীত।

নব-নীরদ-বর্ণ, কি সে গণ্য, শ্যামচাঁদ-রূপ হেরে
হাতে বাঁশী, অধরে হাসি, রূপে ভুবন আলো করে।
গুচ্ছ শিখি-পুচ্ছ শিরে, তুচ্ছ কোটী কাম হেরে,
উচ্চ জাতি-কুল-ধরম, সরমে সতী জাতি ছাড়ে।
জড়িত পীতবসন-জিনি, তড়িতে করে ঝলমল,
আন্দোলিত চরণাবধি হৃদি-সরোজে বনমাল,
লইতে যুবতীর জাতি-কুল, আলো করে যমুনা-কুল।
নন্দকুল-চন্দ্র জিনি চন্দ্র কোটী নিন্দরে রে,
আমি কিরূপে করি ব্যাখ্যা, নহে তুলন, ত্রৈলোক্যে,
রসময়ের যুগলাক্ষে, যুবতী-কুল নাহি রক্ষে,
চাহিলে বাঁকা চক্ষে, মিটে কোন অক্ষে।
আমি কলসী ধরে কক্ষে, হয়েছি তার পক্ষে রে।
শ্যাম গুণধাম পশি ছাম হৃদি-মন্দিরে,
মান মন জ্ঞান প্রাণ, হ'রে নিল বলাৎকারে,
গঙ্গানারায়ণে বলে, কিরূপে জানিবে তারে।
জানিতে যদি যেতে যমুনা, যমুনা, জল আনবারে॥

কন্যা-পালন ঃ—মলুটীর রাজপরিবার বংশজ ব্রাহ্মণ, দেশাচার অনুসারে এই বংশের কন্যাগণের শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইবার কোন অন্তরায় ছিল না, কিন্তু আনন্দচন্দ্র রাজা বল্লাল-প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য-মর্য্যাদার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই কারণে তিনি ব্যবস্থা করিলেন, যে, অতঃপর তাঁহাদের দুহিতাদিগকে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী ও বল্লভী এই চারি শ্রেণীস্থ কুলিন-সন্তানের হস্তে সম্প্রদান করিবেন। তদবধি একাল পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দচন্দ্রের কোমল অন্তঃকরণে আর একটী ভাবের উদয় হইল। যে ঔরসে যে ক্ষেত্রে পুত্রের জন্ম, সেই ঔরসে সেই ক্ষেত্রে কন্যার জন্ম। বাল্যকাল হইতে উভয়কে সমভাবে সুখের ক্রোড়ে আদরে স্নেহে লালিত-পালিত করিয়া, একজনকে যথাসর্ব্বস্ব দান, আর একজনকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া চিরনির্ব্বাসন, এই প্রকার ব্যবস্থা-বৈষম্য আনন্দচন্দ্রের বড়ই অসদৃশ ও পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হইল। তিনি এই কুপ্রথার আংশিক প্রতিবিধানে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। যাঁহারা সদ্বংশজাত সুবিদ্বান্, চরিত্রবান্ ও সদাচারনিরত এবং উক্ত চারিশ্রেণীর কোন এক শ্রেণীভুক্ত কুলিন, সাংসারিক অবস্থা যাঁহাদের স্বচ্ছল নহে, বরং দরিদ্র এবং যাঁহারা পৈতৃক আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগীভূসম্পত্তি স্বেচ্ছায়

গ্রহণ করিয়া মলুটীতে বসবাস করিতে পারিবেন, এইরূপ সৎপাত্র অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সহিত কন্যাগণের বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলন করিলেন। রাজকন্যা-বিবাহ, গৃহাদি নির্ম্মাণের বাস্তুভূমি ও প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি, গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী নিষ্কর ভূসম্পত্তি-লাভ, একাধারে এতগুলি উপভোগের প্রলোভন কয়জন লোক পরিত্যাগ করিতে পারে? সুতরাং আনন্দচন্দ্রের সংকল্প কার্য্যে পরিণত হইবার কোন বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। অতঃপর রাজবংশীয় কন্যাগণের বিবাহ এইভাবেই হইতে লাগিল। কালে দৌহিত্রগণের পরিমাণ এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের সংখ্যা, মূল বংশধরগণের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। মলুটীতে এক্ষণে যে সকল কুলিন-সন্তান বাস করেন, তাঁহারা সকলেই রাজবংশের দৌহিত্র এবং কাহাকেও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য পরদারস্থ হইতে হয় না। রাজবংশের অনেকেই নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করায় অনেক দৌহিত্র-সন্তান তাঁহাদের মাতামহের সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারাপুরে পূজার ব্যবস্থা ঃ—মলুটীর সাত মাইল পূর্ব্বে হিন্দুর পবিত্র ও প্রসিদ্ধ তীর্থ তারাপুর অবস্থিত। তারাপুরে ৺তারামাতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে, আর্য্য-ঋষি বশিষ্ট এই তারাপুরে তারামাতার কঠোর উপাসনায়

সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দেশ দেশান্তর হইতে কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত ভক্ত সাধক, কত ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহাপুরুষের তারাপুরে সর্ব্বদাই সমাগম হইয়া থাকে। একদা গভীর নিশীথে আনন্দচন্দ্র স্বপ্ন দেখিতেছেন যে, তারামাতা যেন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা এবং তিনি কহিতেছেন, বৎস! আমার পরম ভক্ত রাজা রাখড়চন্দ্রের তুমি বংশধর, তোমার হস্তে আমি পূজা গ্রহণের অভিলাষিণী, আগামী শারদীয়া শুক্লা চতুর্দ্দশীতে তুমি আমার পূজার ব্যবস্থা করিও। আনন্দচন্দ্র তখন জাগ্রত কি নিদ্রিত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। মাতৃমূর্ত্তি এবং তাঁহার এই স্বপ্নাদেশ আনন্দচন্দ্রের অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সমাবেশ করিয়া তাঁহার দেহ পুলকিত করিয়া তুলিল। যিনি পরম সাধক—শ্রীভগবানের ধ্যানে অনুক্ষণ বিভোর—এরূপ মহাপুরুষের পক্ষে এইভাবে ভগবৎ-সন্দর্শনরূপ সিদ্ধিলাভ বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। কি নিদ্রা কি জাগরণ সর্ব্বক্ষণই সচ্চিদানন্দময়ী জগন্মাতা যে তাঁহার হৃদয়েই বিরাজমানা! আনন্দচন্দ্র সেই অবস্থায় কণ্টকিতদেহে বলিলেন, মা! তোমার দয়ায় ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু মা তারাপুর আমাদের অধিকারভুক্ত স্থান নহে, এই পবিত্র ভূমি অন্য ভূস্বামীর অধিকৃত এবং তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও ব্যবস্থায় তোমার পূজাদি হইয়া থাকে। সেস্থানে সর্ব্বাগ্রে আমার পূজা

প্রদান কি সম্ভব হইবে? তারা মা তদুত্তরে কহিলেন, নদীর পরপারে কবিচন্দ্রপুর, তুমি কবিচন্দ্রপুরের যে কোন স্থানে আমার পূজা ও বলির ব্যবস্থা করিবে, আমি অগ্রে তোমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া অন্যের পূজা লইব। এই বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন, আনন্দচন্দ্রের নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল!

তারাপুরের নিম্নে যে উত্তরবাহিনী ক্ষুদ্র নদী আছে, এই নদীর পূর্ব্বে তারাপুর এবং পশ্চিমে কবিচন্দ্রপুর। কবিচন্দ্রপুর তৎকালে মলুটীর রাজাগণের কোন আত্মীয়ের সম্পত্তি ছিল। আনন্দচন্দ্র মায়ের আদেশে কবিচন্দ্রপুরে শারদ-শুক্লা-চতুর্দ্দশীতে ষোড়শোপচারে পূজা ও বলির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই দিনে পাণ্ডারা মন্দির হইতে মাতৃমূর্ত্তি বাহির করিয়া 'লাটমন্দিরের' বিরামখানায় স্থাপিত করেন। হিন্দুগণের উপাস্য মহাশক্তির মূর্ত্তিসমূহ সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী হইয়া স্থিতি করেন। দেবীমূর্ত্তি বিরামখানায় আনীতা হইলে সেই ভাবেই স্থাপিতা হইল; কিন্তু সেই সময়ে সহসা দক্ষিণমুখ হইতে পশ্চিমমুখে মায়ের মূর্ত্তি ঘুরিয়া গেল। পাণ্ডা সকল এই অকল্পিত বিস্ময়জনক ব্যাপারে ও দৃশ্যে ভীত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্ত পরেই মা আবার দক্ষিণমুখিণী হইলেন।

মলুটীর জমিদারগণের পূজা ও বলির ব্যবস্থা আজও

পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে পাণ্ডাগণ বিরামখানায় মাতৃমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া প্রথমেই কিছুক্ষণ পশ্চিমমুখেই স্থাপন করিয়া থাকেন।

দুর্গোৎসব :—আনন্দচন্দ্রের পূর্ব্বে রাজবংশে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা ছিল না। বাঙ্গালীর ঘরে বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত পরিবারে দুর্গোৎসব না হইলে পারিবারিক সুখ-শান্তি অপূর্ণ রহিত। এই হেতু আনন্দচন্দ্র শারদীয় দুর্গোৎসবের উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। কিন্তু পূজাস্থাপনের প্রথম বৎসরেই এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। আনন্দচন্দ্রের একটী পুত্র সপ্তমী পূজার দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পরবৎসর গঠিত প্রতিমার পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল। প্রতিমার পরিবর্ত্তে ঘটে পূজার ব্যবস্থা হইল। তদবধি একাল পর্য্যন্ত ঘটে পূজার ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। আনন্দচন্দ্র পূজার সকল কার্য্যেই এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, ভাবী বংশধরেরা গ্রহবৈগুণ্যে হীনাবস্থ হইলেও পূজা যেন কখনও বন্ধ না হয়। পুরোহিত, পাণ্ডা, ছেত্তা, বাদ্যকর প্রভৃতি নির্ব্বাচিত করিয়া প্রত্যেককেই তিনি কিছু কিছু নিষ্কর জমি প্রদান করিলেন, ঘৃত, পাঁঠা, আতপচাউল, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আবশ্যক দ্রব্যাদি যথাসময়ে উপস্থিত করিয়া দিবার জন্য লোক স্থিরীকৃত করিয়া দিয়া তাহাদিগকেও ঐ ভাবে জমি দিলেন। ঐ সকল লোকেরা বংশাবলীক্রমে যাহার

যাহা করণীয়, তাহা করিবে, যাহার যাহা দেয়, সে তাহা দিবে এবং সেই জমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিবে। এখন পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থানুসারেই সকল কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। কালসহকারে সকল অংশীদারেই আপন আপন তরফে ঐরূপ পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অজাবলির সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। দুর্গোৎসবে প্রায় তিন শত বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে।

শ্যামাপূজা ঃ—দুর্গোৎসবের পর শ্যামাপূজার ব্যবস্থাও হইল এবং সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য দুর্গোৎসবের ন্যায় লোক স্থির হইল। তাহাতেও তাহাদিগকে পারিশ্রমিকের এবং মূল্যের পরিবর্ত্তে চিরকালের জন্য নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হইল।

মলুটীর শ্যামাপূজা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। শ্যামাপূজা এখানে মহা মহোৎসবের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। দেশের সর্ব্বত্র "পূজা" বলিলে দুর্গোৎসবকেই বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু মলুটীতে পূজা বলিলেই সাধারণতঃ লোকে শ্যামাপূজা বুঝিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে মলুটীর জমীদারীর অংশীদারগণের মধ্যে আট খানি শ্যামামূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। শ্যামা-পূজায় রাজবংশীয়গণের এবং গ্রামের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসি-গণের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছেন, সকলেই সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া আনীত হইয়া থাকেন! কুটুম্ব-স্বজন

নিমন্ত্রণপ্রাপ্তির জন্য আগ্রহান্বিত ও উৎসুক থাকেন এবং নিমন্ত্রণ হইলে কেহই তাহা প্রত্যাখ্যান করেন না। ভদ্র-লোকেরা সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করেন না, কিন্তু এই সময়ে দরিদ্রলোকেরা বড় অসুবিধা ভোগ করে। তাহাদের গৃহও ঐরূপ আত্মীয়-স্বজনে পরিপূর্ণ হয় এবং তাহারা তাহাদিগের সৎকারের গুরুব্যয়ভার বহনে ভীষণ ক্লেশ ভোগ করে। এক রাত্রির পূজা ; এই এক রাত্রিতেই লোকে পরিশ্রান্ত ও পরিক্লান্ত হইয়া পড়ে। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটায়, জনকোলাহলে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। পূজার রাত্রিতে গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণভোজন হয় এবং গ্রামবাসিগণ পরস্পর পরস্পরের গৃহে পর্য্যাপ্ত আহারে পরিতৃপ্তি লাভ করেন। সারা রজনী ঢাক ঢোলের গম্ভীর-মধুর শব্দে পল্লীর গগন পবন নিনাদিত হইতে থাকে, ঘোর তমসাবৃত রজনী উজ্জ্বল আলোকমালায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। সকল স্থানে বারুদসহযোগে অগ্নিক্রীড়া হওয়ায় লোকের অপরিসীম আনন্দ উপভোগ হয়। নিশীথ রাত্রিতে শ্যামামায়ের পূজা হয় এবং পূজার পরই বলিদান আরম্ভ হইয়া মহানিশার অবসান পর্য্যন্ত শত শত বলিদান চলিতে থাকে। পাঁচ শতেরও অধিক অজা, মহিষ, প্রভৃতির বলি হইয়া থাকে। ভদ্রবংশীয় যুবকেরা ধর্ম্মপ্রাণ, নিজেরাই পাঁঠা বন্ধন করেন এবং

৫।৭ জন মিলিয়া উভয়দিকে সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া আকর্ষণ করিতে থাকে। বলিপ্রদানের পূর্ব্বে নিরাপদে ছেদন হইবার জন্য সমবেত জনতা "মা ব্রহ্মময়ী", "জয় মা জগদম্বে" প্রভৃতি বলিয়া উচ্চকণ্ঠে জগন্মাতাকে ডাকিতে থাকে। তাহাদের প্রাণের সেই আকুল আহ্বান ও ভক্তিগদগদ-ভাব দেখিলে অন্তঃকরণে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। ছেদন হইবামাত্র কর্ত্তিত পাঁঠার রুধির ধারা লইয়া মহা-শক্তিরূপা জগদম্বার যুবক পুত্রগণ সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে থাকে এবং "ওমা দিগম্বরী নাচ গো" বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই মধুময় স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলে অতি পাষণ্ড নাস্তিকের হৃদয়ও ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

দীপান্বিতা রজনীর উৎসব ঐ ভাবে সমাধা হইলে প্রভাতে মায়ের প্রসাদ অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত হইয়া, পরে আপামর চণ্ডালকে বিতরিত হয় এবং সকলে উদরপূর্ত্তি করিয়া প্রসাদ ভোজনে জীবনসার্থক করে। তৎপরেই বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিয়া উঠে। মলুটীর প্রায় চতুর্দ্দিকে সাঁওতালের বাস, বেলা ১২টা হইতে দলে দলে সাঁওতালগণ গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, তাহাদের নরনারী সুরাপানে উন্মত্ত। পুরুষগণের অধিকাংশই হস্তে বৃহৎ বৃহৎ লাঠি ও কেহ কেহ "মাদল" প্রভৃতি তাহাদের বাদ্যযন্ত্র লইয়া আইসে। দুই ঘণ্টা মধ্যে এত অধিক লোক সমাগম হইয়া পড়ে যে, পল্লীর অভ্যন্তরে আর তাহাদের

স্থান সঙ্কুলান হয় না। বেলা ২টার সময় প্রতিমাগুলি বাহির হইতে থাকে। ভদ্রলোকেরা সন্তান-সন্ততি সহ মনোহর পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মাতৃমূর্ত্তির অনুগমন করেন। সুরাপানে সাঁওতালেরা উন্মত্তপ্রায় ও জ্ঞানশূন্য হয়, তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য মাতৃমূর্ত্তির আসে পাশে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সহ জমিদারেরা স্বয়ং গমন করেন। সকল প্রতিমা গ্রামের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকে এবং এক এক তরফের প্রতিমা অন্য অন্য তরফে লইয়া যাওয়ার পদ্ধতি আছে। এই ভাবে গ্রাম প্রদক্ষিণ ও অপর সকলকে দর্শন করান শেষ হইলে সমুদায় প্রতিমা গ্রামের বাহিরে আনীত হয়। পল্লীর দক্ষিণভাগে এক বিশাল প্রান্তর আছে। আট খানি প্রতিমাই এই উন্মুক্ত বৃহৎ প্রান্তরে একত্র হয় এবং সমগ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া মাতৃমূর্ত্তি বহুবার প্রদক্ষিণ করা হয়। প্রতিমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহস্র সহস্র সুরা-পানোন্মত্ত সাঁওতালগণ লাঠিহস্তে দৌড়িতে থাকে, সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, মা যেন সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস মানসে সহস্র সহস্র সৈন্য-সামন্ত সহ রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়াছেন, তৎকালের অপরূপ দৃশ্য যে না দেখিয়াছে, তাহাকে ভাষার সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র এবং তাহার যথাযথ বর্ণনা করাও লেখকের শক্তির অতীত। দুই ঘণ্টা কাল বিশাল প্রান্তরে এইরূপ রণলীলার অভিনয় ও

প্রমত্তগণের তাণ্ডব নৃত্য হইতে থাকে। শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্দ্দিষ্ট পথে প্রতিমা সকলের প্রদক্ষিণ হয় এবং পার্শ্বে সাঁওতাল রমণীগণ বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও এইভাবে বিসর্জ্জনের উৎসব চলিতে থাকে। গ্রামপ্রান্তে এই বিস্তৃত প্রান্তরে বিংশসহস্র লোকের সমাগম হয়। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিমা সমূহ পুষ্করিণী-সলিলে বিসর্জ্জিত হয়। প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই বিরাট্ জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। এক রাত্রি ও একদিনের পরিশ্রমে গ্রামবাসীর এমন অবসন্নতা আসিয়া পড়ে যে, প্রতিমা বিসর্জ্জনের ২।৩ ঘণ্টা পরেই পল্লী নীরব নিস্পন্দ, এই স্থান যে লোকালয়, তাহা মনে হয় না।

মলুটীর চতুর্দ্দিকের অধিকাংশ অধিবাসীই সাঁওতাল। সাঁওতালগণ অসভ্য ও নিরীহ, এই অঞ্চলের সাঁওতালেরা কৃষিজীবী, প্রায় সকলেরই কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী জমি আছে। এই অসভ্য জাতি সরলতার আধার, রাজপুরুষদিগের সাঁওতালগণের উপর বিশেষ সহানুভূতি ও দয়া আছে। কৃষিজাত শস্যে ও শ্রমলব্ধ উপার্জ্জনে ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সহজেই নির্ব্বাহিত হয়, কিন্তু মহাজন-গণের নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অতিরিক্ত সুরাপানে বৎসরের কয়েক মাস ইহারা দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু এই জাতি

এরূপ নির্ব্বিকার ও প্রসন্নমনাঃ যে, দৈন্য-দুর্দ্দশা তাহাদিগকে কাতর করিতে পারে না। ঘরের খাইয়া পরের আনন্দে ইহারা যেরূপ যোগদান ও আমোদ উপভোগ করে, অপর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্ট হয় না। মলুটীর শ্যামাপূজা ইহারাই সমধিক উৎসবময়ী করিয়া এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করে।

আনন্দচন্দ্র বিলাস-ব্যসনের ধার ধারিতেন না। শত শত সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া তাঁহার জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি শিবমন্দির ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। "আনন্দসাগর"-নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী এখনও তাঁহার কীর্ত্তি-স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার শতমুখী কর্ম্মসাফল্য তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে এবং বংশাবলীর মানস-কন্দরে আজও তাঁহার মধুময় স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। রাখড়চন্দ্রের বংশধর যে সর্ব্বপ্রকারে অনন্ত সদ্‌গুণের আধার হইবেন, ইহা বলাই বাহুল্য। জগচ্চন্দ্র, কালীশঙ্কর ও রঘুনন্দন নামক তিন উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া আনন্দচন্দ্র পরলোকগমন করেন। জগচ্চন্দ্রের বংশাবলী জ্যেষ্ঠানুক্রমে বিংশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু ২০ বৎসর মধ্যে জগচ্চন্দ্রের শেষ বংশধরের শোচনীয় অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছে, সে মর্ম্মন্তুদ দুঃখের কাহিনী যথাস্থানে সহৃদয় পাঠকগণকে জ্ঞাত করিব।

কালীশঙ্করের বংশে এক্ষণে কেহ নাই, রঘুনন্দনের পুত্র ক্রমে বংশলোপ হইয়া বিষয়-সম্পত্তি দৌহিত্রগত হইয়াছে। পুস্তক-পরিশিষ্টে রাজবংশের বিস্তৃত তালিকা সংযোজিত হইল।

রাখড়চন্দ্রের অপর পুত্র প্রাণনাথের উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণ নাই। তিনি ধীরচন্দ্র ও নন্দকুমার নামক দুই পুত্র রাখিয়া পঞ্চত্ব লাভ করেন। ধীরচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। প্রাণনাথের দ্বিতীয় পুত্র নন্দকুমার উপযুক্ত সুশিক্ষা লাভ করিয়া গুণী জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। নন্দকুমারের উপযুক্ততা ও শিক্ষা-দীক্ষার কথা রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহাকে মুন্সেফের পদ প্রদান করিয়াছিলেন। নন্দকুমারের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচারের কথা কর্তৃপক্ষের অবিদিত রহিল না। অবিলম্বে কর্তৃপক্ষের আদেশে নন্দকুমার মুন্সেফের পদে স্থায়ী হইলেন এবং তাঁহার সুবিচারে রাজা প্রজা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। দিন দিন তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং রাজপুরুষগণের নিকট তিনি সমধিক সম্মানিত হইতে লাগিলেন। মলুটীর ২॥০ ক্রোশ দূরে খড়বনা গ্রামে তৎকালে আদালত ছিল, নন্দকুমার তথায় বাসা করিয়া অবস্থিতি করিতেন। নন্দকুমারের বাসায় সকলেরই অবারিত দ্বার ছিল, মধ্যাহ্নকালে ভোজনের সময়

যে উপস্থিত হইত, সেই সাদরে অন্ন পাইত। বেতনের টাকায় নন্দকুমারের বাসার ব্যয় সংকুলান হইত না; বাড়ী হইতে তাঁহাকে অনেক অর্থ গ্রহণ করিতে হইত। কয়েক বৎসর কার্য্য করার পর, তিনি একটী সামান্য ঘটনায় মুন্সেফের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। একদিন নন্দকুমার আহার করিতেছেন, ব্যঞ্জনসমূহের প্রথমেই শাক ভোজন করিয়া পাচক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন উপাদেয় সুমিষ্ট শাক কোথায় পাইলে? পাচক বিনীতভাবে বলিল, যে সকল লোক এখানে মোকদ্দমা করিতে আসিয়াছে, তাহাদের একজন কতকগুলি শাক লইয়া আসিয়া বলিল, আমার গৃহে এই নূতন শাক উৎপন্ন হইয়াছে, আমি কিছু শাক হাকিমের জন্য লইয়া আসিয়াছি, আপনি এইগুলি গ্রহণ করুন—সেই শাক অদ্য আপনাকে রন্ধন করিয়া দিয়াছি। ব্রাহ্মণের মুখে শাকের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া নন্দকুমার বিষণ্ণ ও বিচলিত হইলেন এবং তাঁহার মনে হইল, এই শাক উৎকোচ-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। বিচারপতি উৎকোচগ্রাহী হইলে মহাপাপের ভাগী হয়েন এবং তাঁহার সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকগামী হইয়া থাকেন। হয় ত কত সময়ে অলক্ষ্যে এইরূপ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে। নন্দকুমার এই ভাবিয়া সেই দিনই কর্ম্মত্যাগ-পত্র লিখিয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মত্যাগ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া জেলা

জজ তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার মুখে কর্ম্মত্যাগের বিবরণ শুনিয়া ত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য বার বার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ দৃঢ়চিত্ত নন্দকুমারের নিকট জেলা জজের অনুরোধ উপেক্ষিত হইল। তিনি বলিলেন, এ সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া আমার বহু জন্মার্জ্জিত অস্তেয়-সাধনা পণ্ড করিতে চাহি না। হায় সে কাল ! আর এ কাল !!

গৃহে ফিরিয়া নন্দকুমার জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মচর্চ্চায় অতিবাহিত করিলেন। কিছুদিন পরে নন্দকুমার ভৈরবচন্দ্র নামক একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

ভৈরবচন্দ্র বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মোন্মাদ ছিলেন, সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। পিতামাতা জোর করিয়া তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ভৈরবচন্দ্রের দেহ কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়; ঘৃণিত ব্যাধির আক্রমণে তিনি সংসারবাস ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইবার সংকল্প করেন। এই সময়ে তাঁহার গুরুদেব মলুটীতে শুভাগমন করেন। তিনি সমুদায় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ভৈরবচন্দ্রকে কালীসাধনা করিতে উপদেশ দেন। ভৈরবচন্দ্রের কালীবাড়ী শ্মশানের সন্নিকটে অবস্থিত, সে সময়ে ঐ কালীবাড়ীর চতুর্দ্দিক্ ভীষণ বন-জঙ্গলে

পরিপূর্ণ ছিল এবং সময়ে সময়ে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু তথায় দেখা যাইত। বর্ত্তমান সময়ে কালীবাড়ী সম্পূর্ণভাবে বন-জঙ্গলশূন্য হইলেও রাত্রিকালে সেই স্থান দিয়া যাতায়াত করিলে দেহ কণ্টকিত ও কি এক আকস্মিক ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠে। গুরুর আদেশে এই বিভীষিকাময় স্থানে প্রত্যহ গভীর রজনীতে ভৈরবচন্দ্র শিবশক্তির সম্মিলিত জগন্মঙ্গল মূর্ত্তি শ্রীমহাকালীর উপাসনা করিতেন। অল্পদিনেই কঠোর তপস্যায় ভৈরবচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং দেবীর কৃপায় তাঁহার গলিতকুষ্ঠ সম্পূর্ণভাবে উপশমিত হইল। রোগারোগ্যের এক বৎসর পরে তাঁহার পত্নী এক কন্যা প্রসব করেন। কন্যাজন্মের রাত্রিতে ভৈরবচন্দ্র কাহাকেও কিছু না বলিয়া পরিবারবর্গের অগোচরে গৃহত্যাগ করেন।

মলুটী হইতে ২২।২৩ ক্রোশ দূরে ভৈরবচন্দ্রের একটী আংশিক জমিদারী ছিল। গৃহত্যাগ করিয়া ভৈরবচন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন এবং তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থে ভৈরবচন্দ্রের কাশীবাসের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়াই তিনি তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। তত্রত্য জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থ ভৈরবচন্দ্রের আংশিক সম্পত্তি ক্রয় করিতে সম্মত হয়েন। ভৈরবচন্দ্র যথাসম্ভব মূল্য গ্রহণ

করিয়া একখানি দলিল লিখিয়া দেন। সে সময়ে দলিল রেজেষ্টারী করিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই। ভৈরবচন্দ্র ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া স্বহস্তে একখানি দলিল লিখিয়া দিলেন এবং সেদিন কোথাও না গিয়া গৃহস্থগৃহেই রাত্রি যাপন করিলেন; এবং সম্পত্তি-বিক্রয়ের টাকা গৃহস্থের জিম্মায় রাখিয়া দিলেন। পরদিন প্রভাতে পল্লীর নিকটে প্রবাহিতা ভাগীরথীতে স্নান করিয়া ভৈরবচন্দ্র পুনরায় গৃহস্থের নিকট আসিলেন এবং তাঁহার মজুত টাকা দিবার জন্য বলিলেন। তদুত্তরে গৃহস্থ বলিল, কৈ আপনি ত আমার নিকট কোন প্রকারের টাকা গচ্ছিত রাখেন নাই; অকারণে কেন আমাকে মিথ্যাকলঙ্কে কলঙ্কিত করিতেছেন? গৃহস্থের এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে ভৈরবচন্দ্র বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। এই প্রস্থানই ভৈরবচন্দ্রের মহাপ্রস্থান হইল; আর তিনি গৃহপ্রত্যাগত হয়েন নাই, অথবা কোন স্থানে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ভৈরবচন্দ্র গমনকালে ঐ গৃহস্থকে বলিয়াছিলেন, তুমি অর্থলোভে আজ যে ভীষণ দুষ্কার্য্য করিলে, অনতিবিলম্বে তাহার কুফল তোমাকে সাংঘাতিক ভাবে ভোগ করিতে হইবে।

পরে জানিতে পারা গিয়াছিল, অভিশপ্ত গৃহস্থ বৎসর মধ্যে সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল। ভৈরবচন্দ্রের পুত্র সন্তান

হয় নাই, তাঁহার কন্যা পরিত্যাজ্য সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন এবং সেই সম্পত্তি এক্ষণে তদীয় দৌহিত্রেরা ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

এই সময়ে রাজপরিবারের এবং সাধারণ অধিবাসিগণের সুখশান্তির সীমা পরিসীমা ছিল না। গ্রামে জনবহুলতা হেতু বন-জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া গিয়াছিল। পল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ গভীরঅরণ্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে দুর্গম ও দুর্ভেদ্য ছিল। সংক্রামক ব্যাধির লেশমাত্র ছিল না। অধিবাসিগণের হৃষ্টপুষ্ট কান্তিপূর্ণ দেহ দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। অকালমৃত্যু প্রায় ছিল না, সাধারণতঃ সকলেই সুস্থদেহে দীর্ঘ পরমায়ু ভোগ করিত। গাভীসকল বনজাত লতা পাতা ও তৃণ ভক্ষণ করিয়া পরম সুস্বাদু অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধ প্রদান করিত, পুষ্করিণীসমূহ প্রচুর মৎস্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত, উর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহে এত অধিক শস্য উৎপন্ন হইত যে, কোন সময়ে গৃহস্থের ধান্যের গোলা শূন্য হইত না। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি গলায় গলায় আহার করিয়া লোকে পরিপাক করিতে পারিত। কাহারও পোষাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর ছিল না। পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মনোমালিন্য প্রায় ঘটিত না। সামান্য সামান্য ঘটিলে পাছে কোন মিথ্যা ব্যবহার করিতে হয়, এই ভয়ে লোকে আদালতের ছায়া স্পর্শ করিত না। সরিকানী বিবাদ

নিজেরাই মীমাংসা করিয়া লইত। আত্মীয়-স্বজনের আপদ বিপদে সকলেই অকপট সহানুভূতি-সহকারে যোগদান করিত, আশ্রিত অনুগতের অভাব দুঃখে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইত না। সাধু সন্ন্যাসী দ্বারস্থ হইলে সাদরে অভ্যর্থিত ও সৎকৃত হইত। অভাবগ্রস্ত বিপন্ন শরণাগত হইলে উপযুক্ত সাহায্য পাইয়া বিপন্মুক্ত হইত। স্ত্রীলোকেরা গৃহের অন্নপূর্ণা ও লক্ষ্মীরূপিণী ছিলেন। পতিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহারা পূজা করিতেন এবং বেশভূষা অলঙ্কারাদির জন্য বিরক্ত বা বিব্রত করিতেন না। প্রত্যেক গৃহেই সর্ব্বদা ব্রত-পূজার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রভোজন হইত। সঞ্চিত অর্থ কোষাগারে আবদ্ধ না থাকিয়া, বিবিধ সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া কেহ জলগ্রহণ করিতেন না। অবসর সময় নানা শাস্ত্রচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। সামাজিক শাসনের প্রভাব এত অধিক ছিল যে, তাহার আশঙ্কায় কেহ কোন দুষ্কার্য্য করিতে সাহসী হইত না। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল সুখশান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায় লোকে স্বর্গসুখ উপভোগ করিত।

এতকাল রাজপরিবার তাঁহাদের বহুবিস্তৃত সম্পত্তি বিনা করেই ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির রাজাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ বিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ানীপদ গ্রহণ করেন

এবং দেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া ভূস্বামীবর্গের অধিকৃত সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে রাজকর স্থির করিয়াছিলেন। ক্রমে গঙ্গাগোবিন্দ মলুটীও আগমন করেন। গ্রামে বহুল শিবমন্দির এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণ রাজবংশীয়দিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সরলতা ও উদার অমায়িক ভাব দেখিয়া তাঁহার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার নিকট সকলে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময় ব্রাহ্মণোচিত জাতীয় চিহ্নসমূহ দর্শন করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ মুগ্ধ হইলেন। স্থানীয় অনুসন্ধানে তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া গঙ্গাগোবিন্দ মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই সকল দেবস্বভাব, সরলতার আধার মহাপুরুষগণের আমার দ্বারা যদি কোন প্রকার বৈষয়িক ক্ষতি বা অনিষ্টের কারণ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমার জীবন বৃথা এবং আমাকে সে দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে। অধিকন্তু এই পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ভূস্বামিবর্গের যাহাতে ইষ্টসাধন হয়, আমি তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া তদনুরূপ সুব্যবস্থার অনুষ্ঠানে শক্তিসাধ্য চেষ্টা যত্ন করিব। তিনি সমাগত রাজবংশীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আপনারা যে ভাবে বিনাকরে বিশাল সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আপনাদিগের সে সুবিধা ও সুযোগ থাকিবে না। হয় ত কোন রাজপুরুষ আপনাদের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করণে অক্ষম হইয়া অন্যান্য জমিদার-

গণের ন্যায় আপনাদের সম্পত্তির বৃহৎ কর ধার্য্য করিয়া দিতে পারেন, এই সকল বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, আপনাদের সম্পত্তির উপর যৎকিঞ্চিৎ কর স্থির করিয়া দিব এবং তাহার উপর সুদূর ভবিষ্যতে যাহাতে কেহ কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিব। এইরূপ কথোপকথনের পর, তিনি লক্ষাধিক টাকা আয়-বিশিষ্ট সম্পত্তির উপর কেবলমাত্র ২৭৯৶২ টাকা কর স্থির করিয়া দিলেন। এই করের কখন বৃদ্ধি হইবে না, তাহা [illegible] দিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোর্ড অফ্ রেভিনিউ দ্বারা [illegible] [illegible]ইয়া দিলেন। এই কর "জয়েদ জমা" নামে [illegible] এবং মলুটী-ষ্টেটের জন্য এখন পর্য্যন্ত ঐ পরিমাণ [illegible] [illegible]মানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের হাত দিয়া [illegible] দিতে হয়। বলা বাহুল্য, গঙ্গাগোবিন্দের এই [illegible]চিত হিতৈষণা ও বিপুল উপকারে রাজবংশীয়েরা তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার নিকট দুর্ভেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে চির আবদ্ধ রহিয়াছেন।

রাজা রাজচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীচন্দ্রের ও স্বরূপচন্দ্রের অথবা তাঁহাদের বংশাবলীর কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা নাই। পৃথ্বীচন্দ্রের লালচন্দ্র ও অনুপচন্দ্র নামক দুই পুত্রের মধ্যে লালচন্দ্রের বংশাবলী পুত্রাদিক্রমে সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন, অনুপচন্দ্র ও তাঁহার খুল্লতাত স্বরূপচন্দ্রের

পুত্রাভাব হেতু তাঁহাদের সম্পত্তি দৌহিত্রগত হইয়াছে। রাজা জয়চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্রের বংশাবলী শাখা-পল্লবে সুসজ্জিত হইয়া তদীয় পবিত্র স্মৃতি মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন। রামচন্দ্রের প্রপুত্রের-প্রপুত্র হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ-পুত্র অন্নদাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতে তপস্যাপ্রিয় ছিলেন। যৌবনে তিনি "সতীঘাটে" শবসাধনা করিতেন এবং তন্ত্রোক্ত কঠোর তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। এই মহাপুরুষ পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করিয়া, ত্রিংশবর্ষ বয়ঃক্রমে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র মানদাপ্রসাদ বিবিধ সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। বৈষয়িক কার্য্যে মানদাপ্রসাদের তাদৃশ স্পৃহা ছিল না, তিনি সাধারণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে মানদাপ্রসাদ মলুটী সমাজের অলঙ্কার ও স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিত। তাঁহার মধুর বচনে ও বাগ্মীতায় লোকে মুগ্ধ হইত, মানদা প্রসাদের হৃদয় ভাব-প্রবণ ছিল; তিনি সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। অল্পদিন মাত্র পূর্ব্বে মানদাপ্রসাদ আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত এবং মলুটী তমসাচ্ছন্ন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

* * * * *

রাজা জয়চন্দ্রের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেবের সুবৃহৎ বংশাবলীই বর্ত্তমান সময়ে মলুটী রাজবংশের মূল-পরিবারের পারিবারিক শোভা বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহাদেবের পুত্র সভাচন্দ্র, সভাচন্দ্রের ছয়টি পুত্র। এই ছয় পুত্রের নামানুসারেই দ্বিতীয় সিফির তরফ 'ছয় তরফ' নামে অভিহিত হইয়াছে। ছয় পুত্রের প্রত্যেকেরই একাধিক পুত্র-পৌত্রাদিতে বংশ-বহুলতা সংঘটিত হইয়াছে। শারীরিক বল-বীর্য্যে মহাদেব বংশাবলীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বংশীয়দিগের একজনের অসাধারণ বলবীর্য্যের কথা পাঠকবর্গকে শুনাইব।

মহাদেবের প্রপৌত্র হরচন্দ্র বীরধর্ম্মের উপাসক ছিলেন। হরচন্দ্র দীর্ঘাকার হৃষ্টপুষ্টদেহ এবং কার্ত্তিকেয় তুল্য পরমসুন্দর সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেহে অপরিমিত শক্তি ছিল, কিন্তু সে প্রভূত পরাক্রম কখনও দুর্ব্বলের পীড়াদায়ক হয় নাই। দৈহিক বিক্রমে হরচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে তৎকালে কেহ ছিল না। এক্ষণে পাঠক তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় গ্রহণ করিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।

হরচন্দ্রের জননীর একটী দুগ্ধবতী অতি প্রিয় মহিষী ছিল। সে সময়ে মলুটীর চতুর্দ্দিকে গভীর অরণ্য এবং সেই অরণ্য ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুপূর্ণ ছিল। একদিন মধ্যাহ্ন-কালে মহিষীরক্ষক রাখাল আসিয়া হরচন্দ্রের জননীকে সংবাদ দিল যে, অদ্য বনের ধারে মহিষী চরাইতে ছিলাম,

সহসা বন হইতে এক বৃহৎ ব্যাঘ্র বাহির হইয়া আপনার মহিষীকে তুলিয়া লইয়া গেল। হর-জননী এই দুঃসংবাদে অতিমাত্র বিচলিতা ও শোকাভিভূতা হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, যে বাঘ আমার প্রাণাধিকা মহিষীর জীবন নষ্ট করিয়া রক্তপান করিয়াছে, সেই বাঘকে যাবৎ জীবিতাবস্থায় তুমি আমার নিকটে উপস্থিত না করিবে, সেই সময় পর্য্যন্ত আমি কোন আহার গ্রহণ করিব না। যে জননী হরচন্দ্রের ন্যায় বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন, সন্তানকে নরশোণিতপ্রিয় অমিতপরাক্রমী শার্দ্দূলের সম্মুখীন হইতে আদেশ করা তাঁহার মুখেই শোভা পায়। জননীর আদেশে মাতৃভক্ত বীর সন্তান তীরপূর্ণ তূণ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইচ্ছা করিলে বহু লোকজন সঙ্গে লইতে পারিতেন, কিন্তু তাহার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না; একাকীই অরণ্যাভিমুখে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপনীত হইয়া ব্যাঘ্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইলেন, ক্ষুদ্র লতা-পুষ্পে সমাচ্ছন্ন এক নিভৃত স্থানে ব্যাঘ্র মহিষীর বক্ষোপরি উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্টচিত্তে রক্তপান করিতেছে। ব্যাঘ্রদর্শনে হরচন্দ্রের অন্তঃকরণে ভীতি সঞ্চার হওয়া দূরের কথা, মাতৃ-আজ্ঞা পালনের কোন অন্তরায় উপস্থিত হইল না, এই ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত

আনন্দিত হইলেন। নর-সমাগমে শার্দ্দূল চকিত হইলেও শোণিতপান ত্যাগ করিতে পারিল না। হরচন্দ্রের অব্যর্থ তীরের একটীমাত্র নিক্ষেপেই ব্যাঘ্র পঞ্চত্ব লাভ করিত, কিন্তু জীবিত ব্যাঘ্র লইয়া যাইবার মাতৃ-আদেশ তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি ব্যাঘ্রের অঙ্গবিশেষে লঘুহস্তে তীর সন্ধান করিলেন। তীর আঘাতে ব্যাঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লম্ফ প্রদানে হরচন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইল এবং মুখব্যাদনপূর্ব্বক গভীর নিনাদে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঘোর লম্ফপ্রদান করিল। ব্যাঘ্র ভূমিত্যাগ করিয়া শূন্যোত্থিত অবস্থায় যেমন হরচন্দ্রের দেহে পতিত হইল, অমান হরচন্দ্র ক্ষিপ্রগতিতে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ব্যাঘ্রের গলদেশ ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রকে কক্ষে গ্রহণ করিলেন। জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সফলতা লাভ করিয়া হরচন্দ্র ব্যাঘ্রকক্ষে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। লোকে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ভীত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল। হরচন্দ্র ব্যাঘ্রসহ মাতৃসন্নিধানে পঁহুছিলে জননী হরচন্দ্রকে আদেশ করিলেন, বাঘকে তুলিয়া ধরিয়া থাক, আমি স্বহস্তে উহাকে বধ করিয়া, উহার রক্ত দর্শন করিব। এই কথা বলিয়াই বীরা রমণী গৃহাভ্যন্তর হইতে এক তীক্ষ্ণধার ভুজালী বাহির করিয়া আনিলেন এবং স্বহস্তে ব্যাঘ্রের মস্তক ছেদন করিলেন।

হরচন্দ্র অশ্বারোহণপটু ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ন-

কালে নিয়মিতভাবে অশ্বারোহণ করিতেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে এক বৃহৎ প্রান্তর তাঁহার অশ্বারোহণের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। একদিন হরচন্দ্র দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতেছেন, এইরূপ সময়ে এক ক্ষিপ্ত মহিষ গ্রীবাদেশ উন্নত করিয়া ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে অশ্বের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অশ্ব এই দৃশ্যে চকিত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া প্রবলবেগে দৌড়াইতে লাগিল। হরচন্দ্র বার বার রশ্মি আকর্ষণ করিয়াও অশ্বকে সংযত করিতে পারিলেন না। অশ্ব যে পথে দৌড়িতে লাগিল, সেই পথের পার্শ্বে এক বিশালকায় বটবৃক্ষ ছিল। এই বটবৃক্ষের এক বৃহৎ শাখা সরলরেখাক্রমে সমগ্র পথ অবরোধ করিয়াছিল, তাহার নিম্ন দিয়া মানুষেরা মস্তক কিঞ্চিৎ অবনত করিয়া যাতায়াত করিত। হরচন্দ্রের অশ্বই বৃহদাকার, তাহার উপর, তিনি দীর্ঘকায় লইয়া উপবিষ্ট। অশ্বের বৃক্ষশাখা অতিক্রম কালে হরন্দ্রের বক্ষঃদেশ শাখাতে প্রবলবেগে প্রতিহত হইবে, সেই শাখার নিম্ন দিয়া অশ্ব যে সময়ে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভীষণবেগে ছুটিতে লাগিল, তখন দর্শকেরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল এবং সকলেই স্থির করিল, অদ্য হরচন্দ্রের জীবনরক্ষার আর কোন উপায় নাই। উচ্চৈঃস্বরে দর্শকেরা চীৎকার করিল, হরচন্দ্রকে আসন্ন বিপৎপাতের কথা জ্ঞাত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হরচন্দ্র অনবধান ছিলেন না, অশ্ব বৃক্ষশাখার নিকটবর্ত্তী

হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি রশ্মি ত্যাগ করিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিলেন এবং নিকটস্থ হইবামাত্র শাখাকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া পদদ্বয়ে অশ্বকে পূর্ণশক্তি-প্রয়োগে চাপিয়া ধরিলেন। হরচন্দ্রের সবলে রশ্মি আকর্ষণে অশ্ববেগ সংযত হয় নাই, কিন্তু শাখা অবলম্বনে পদদ্বয়ে অশ্বকে যে চাপ দিলেন, তাহাতে অশ্ব আর একটী পদও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। বীর হরচন্দ্রের অদ্ভুত বীরত্বে দর্শকবৃন্দ আনন্দ-কোলাহলে সে স্থান মুখরিত করিয়া তুলিল।

হরচন্দ্র সময় সময় মৃগয়ায় বাহির হইতেন। একদিন অপরাহ্ণকালে ধনুর্ব্বাণহস্তে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে মৃগয়ায় গমন করিলেন। কানন-অভ্যন্তরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া হরচন্দ্র দেখিলেন, এক বৃহৎ বৃক্ষতলে চল্লিশ জনেরও অধিক নীচ জাতীয় বলশালী ব্যক্তি ঢাল, তরবারি, বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। হরচন্দ্র বুঝিলেন, ইহারা দস্যুদল, নির্ব্বিকারচিত্তে তিনি তাহাদের সমীপস্থ হইলেন। হরচন্দ্রের সুন্দর সুঠাম গৌরকান্তি দেহ, তদুপরি যজ্ঞোপবীত লম্বমান; দলের এক ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া ঈষৎ নতমস্তকে হরচন্দ্রকে প্রণাম করিল। সে কালে দস্যুদিগেরও ব্রাহ্মণ-ভক্তি ছিল। হরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে, কি উদ্দেশ্যে এই স্থানে এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছ? জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ব্যক্তি উত্তর করিল, আমরা দস্যু এবং

আমি এই দলের সর্দ্দার। অদ্য রাত্রিতে মলুটীতে হরচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ডাকাইতি করিব। ঈষৎ হাস্য করিয়া হরচন্দ্র বলিলেন, তোমরা এই সংকল্প ত্যাগ কর। মলুটীতে ডাকাতি করিবার জন্য প্রবেশ করিলে কাহাকেও জীবন লইয়া গৃহে ফিরিতে হইবে না। দস্যুসর্দ্দার বলিল, ঠাকুর! আমরা কোথাও ডাকাতি করিতে হইলে অগ্রে তথাকার সকল সংবাদ সংগ্রহ করি। আপনাদের ধনু ও তীর মাত্র সম্বল; আমাদের এই সকল অস্ত্রশস্ত্রের অগ্রে ধনুতীর লইয়া জীবন দিতে কে অগ্রসর হইবে? আচ্ছা, আপনার হস্তেও তীর ধনু দেখিতেছি। আপনি আমাদিগকে তীরধনুর শক্তি কি প্রকার দেখাইয়া দেন। এই বলিয়া দস্যুসর্দ্দার তাহার কঠিন চর্ম্মাবৃত ঢাল একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের গাত্রে বাঁধিয়া দিল এবং ঢালের মধ্যস্থলে চুণের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সেই চিহ্নিত স্থান ভেদ করিবার জন্য বলিল। হরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ধনুকে তীর সংযোগ করিয়া ধনুর গুণ আকর্ণ-আকর্ষণে চিহ্নিত স্থান লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হরচন্দ্রের তীর ঠিক চিহ্নিত স্থানে বিদ্ধ হইয়া ঢাল ও বৃক্ষ ভেদপূর্ব্বক কিয়দ্দূরে পতিত হইল। তীরের অদ্ভুত শক্তিতে এবং তীর নিক্ষেপের অপূর্ব্ব কৌশলে দস্যুদল চমকিত ও সন্ত্রস্ত হইল। দস্যুদলপতি হরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মলুটীতে আপনার ন্যায় ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী আর কয়জন আছেন? হরচন্দ্র বলিলেন, শতাধিক

ব্যক্তি এই বিদ্যায় সুশিক্ষিত, তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী এবং এই বিদ্যায় সমধিক পারদর্শী, এই জন্যই তোমাদিগকে তোমাদের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে বলিতেছিলাম, এক্ষণে তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর। দস্যুদল মলুটী প্রবেশ করিলে, তাহার পরিণামে কি শোচনীয় দশা উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিয়া সংকল্প পরিত্যাগ করিল এবং সকলে একযোগে হরচন্দ্রকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। দস্যুদল যে হরচন্দ্রের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিল, তাহা তাহারা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না।

হরচন্দ্র দীর্ঘ পরমায়ু ভোগ করিয়াছিলেন, কখনও তাঁহার দেহে কোন প্রকার অসুস্থতা দেখা যায় নাই। হরচন্দ্রের বংশাবলীর সকলেই অল্পবিস্তর বলবীর্য্যসম্পন্ন। এখন পর্য্যন্ত সেই রক্তকণিকার প্রভাব নষ্ট হয় নাই। হরচন্দ্র বংশোজ্জ্বল পুত্র কন্যা রাখিয়া ৮০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

মহাদেবের প্রপৌত্র দেবদত্তের ঔরসে পরেশনাথ নামক আর একজন কর্ম্মবীর পুণ্যবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরেশনাথ প্রতিভাশালী ও কৃতী পুরুষ ছিলেন। মলুটীর পশ্চিম দিকে ৫।৬ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত বন-জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পরেশনাথ বিশেষ চেষ্টা-যত্ন করিয়া নানাস্থান হইতে সাঁওতাল

সংগ্রহ করিলেন এবং এই সকল স্থানে তাহাদের বসবাসের সুব্যবস্থা করিলেন। সাঁওতালেরা বন-জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে এবং পাহাড়-পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া জমি প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত। পরেশনাথের অদম্য চেষ্টা-যত্নে ও উৎসাহে যে সকল সাঁওতাল মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল, তাহারা ২।৪ বৎসর মধ্যে গভীর অরণ্য বনশূন্য করিয়া ফেলিল এবং অনুর্ব্বর ক্ষেত্রসমূহ কর্ত্তন করিয়া চাষোপযোগী জমি করিয়া লইল। পরেশনাথ প্রথম কয়েক বৎসর এই নূতন অধিবাসিগণের নিকট কিছুমাত্র কর গ্রহণ করেন নাই, অধিকন্তু তাহাদিগকে অর্থে ও দ্রব্যাদিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে যখন তাহারা বাসস্থান প্রস্তুত করিল এবং খাল-কন্দর, বন-উপবন স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া জমি প্রস্তুত করিয়া তুলিল, তখন পরেশনাথ সেই সকলের আয়ের উপর ন্যায্য কর ধার্য্য করিলেন। এইরূপে পরেশনাথ সম্পত্তির আয় বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়া ফেলিলেন। এই সকল সম্পত্তির অন্য অংশীদারেরা কেহ অংশ গ্রহণ করিলেন না এবং পরেশনাথের সহিত মামলা-মোকদ্দমা করিয়া গৃহবিচ্ছেদে তাহা উদ্ধার করা অসঙ্গত ভাবিয়া নীরব রহিলেন।

পরেশনাথ সেকালের বিবেকহীন পুলিশকর্ম্মচারীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, কেননা, দেশের শান্তিরক্ষকের

পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক সময় তাহারা নিরীহ প্রজার উপর অত্যাচারে ও উৎকোচ গ্রহণে নানা অশান্তির সৃষ্টি করিত। এইহেতু অনেক দারোগাকে সামান্য কারণে তিনি অপমানিত করিতেন, অনেক দারোগাকে তাঁহার মতবিরুদ্ধ অন্যায় কার্য্য করায়, নানা উপায়ে সমুচিত শিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। রাজকীয় অশিষ্ট কর্ম্মচারীদিগের নানা অত্যাচার দমন করিতে গিয়া পরেশনাথ কয়েকবার আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নানা-বুদ্ধি-কৌশলে সে সকল মোকদ্দমায় প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন।

পরেশনাথের কতকগুলি বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অকাতরে লোককে অন্নদান করিতেন, তিনি মফঃস্বলে যাইলে তাঁহার কাছারীতে প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন হইত, প্রজা ও অন্য লোকজনকে তিনি আহ্বান করিয়া সাদরে খাওয়াইতেন, দীনদুঃখিগণ উপস্থিত হইলে আহারের পরে বস্ত্রও পাইত। কোন দায়গ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তি সাহায্যপ্রার্থী হইলে পরেশনাথ তাহাকে অকাতরে অর্থদান করিতেন। তিনি সংখ্যা নির্ণয় করিয়া কাহাকেও অর্থ দিতেন না, অর্থপরিপূর্ণ বাক্সে হাত দিয়া এক হাতে যে পরিমাণ অর্থ উঠিত, তাহাই অকুণ্ঠিত-হৃদয়ে প্রার্থীকে দিতেন।

পরেশনাথের পুণ্যশ্লোক পিতৃদেব স্বগৃহে নারায়ণশিলার

সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তারাপুরের বিখ্যাত সাধক বামাক্ষেপার নাম হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। এই বামাচরণ জীবনের প্রথমভাগে সাংসারিক অবস্থার অস্বচ্ছলতা-হেতু মাতৃ-আদেশে মলুটীতে চাকরী করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। বামাচরণ অশিক্ষিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার জমিদারী-সংক্রান্ত কোন প্রকার কার্য্য করা শক্তির অতীত ছিল। কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও বাল্যকাল হইতে তিনি ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। মলুটীতে আসিয়া বামাচরণ পরেশনাথের নিকট চাকরীপ্রার্থী হইলে, তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে পরেশনাথ তাঁহাকে নারায়ণ ঠাকুরের পূজক-পদে নিযুক্ত করেন। দুই বৎসর কাল বামাচরণ পূজকের কার্য্য করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি তারাপুরে আশ্রম স্থাপন করেন এবং শিমুলতলার মহাশ্মশানে কঠোর তপস্যা করিয়া তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই বামাচরণই ভবিষ্যতে 'বামাক্ষেপা' নামে দেশপূজ্য হইয়াছিলেন।

পরেশনাথের পুত্রসন্তান জন্মে নাই। তাঁহার পরলোক-গমনের পর তদীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই কন্যা উত্তরাধিকারিণী হয়েন। পরেশনাথের দৌহিত্র ৺ হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরাধিকারি-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও সর্ব্বস্ব যে কারণে হারাইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ এই

স্থানে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই শোচনীয় বিবরণের সহিত রাজবংশীয়গণের সার্ব্বজনীন স্বার্থহানি ও অনেক বিষয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় মঙ্গলের হেতু বিজড়িত রহিয়াছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এল্, ও, স্ক্র্যাপ্স্ক্রুড্ নামক জনৈক খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক ইংরাজ সাঁওতালগণের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার-জন্য এই অঞ্চলে আগমন করেন। স্ক্র্যাপ্স্ক্রুড্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে মহেশপুরের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার জমিদারীর মধ্যে একটী মিশন স্থাপন জন্য কিছু স্থান বন্দোবস্ত লইবার প্রার্থনা করেন। দূরদর্শী রাজা সাহেবের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করায়, স্ক্র্যাপ্স্ক্রুড্ সাহেব মলুটীতে আইসেন। মলুটীর জমিদারগণ চিরকালই নিরীহ, সরল ও উদার-প্রকৃতিক ছিলেন। এই সময়ে রাজা আনন্দচন্দ্রের প্রপৌত্র-পুত্র রাজা মেহেরচন্দ্রকে তোষামদে তুষ্ট করিয়া তিনি বেণাগড়িয়া নামক সাঁওতালপল্লীতে পঞ্চাশ বিঘা পরিমাণ পতিত ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন এবং তথায় এক মিশন স্থাপন করেন। স্ক্র্যাপ্স্ক্রুড্ সাহেব তৎকালে ত্রিংশবর্ষ-বয়স্ক যুবক। ভূমি বন্দবস্ত লইয়া অবিলম্বে সাহেব বেণাগড়িয়ায় এক সুবৃহৎ গির্জ্জাঘর ও বাসোপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করিয়া লয়েন এবং অল্পকালমধ্যেই সর্ব্বপ্রকা[র] উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে

ারেশ-দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রের সহিত রাজা মেহেরচন্দ্রের বৈষয়িক বিরোধ ও মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তৎকালে হরিশ্চন্দ্রের বৈষয়িক আয় ও অর্থ-সামর্থ্য মেহেরচন্দ্র অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল, মেহেরচন্দ্র সে সময়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর কুদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। উভয়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। হরিশের সহিত মেহেরচন্দ্র সর্ব্বপ্রকারে পরাভূত হইয়া সহজেই সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইতেন, কিন্তু স্ক্যাপ্‌ক্রড্‌ সাহেব মেহেরচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তখন উভয়পক্ষে প্রবল বিবাদ চলিতে লাগিল, সালবাদ্রা নামক একটী মহলের দখল লইয়া বিরোধের সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষে বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী পদাতিক ও মুসলমান লাঠিয়াল নিযুক্ত হইয়া প্রায় প্রত্যহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে লাগিল। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিণামে বহুসংখ্যক ফৌজদারী মোকদ্দমার সৃষ্টি হইয়া জলের ন্যায় প্রভূত অর্থের অযথা ব্যয় হইতে লাগিল। কত দারোগা, উকীল, ব্যারিষ্টার বিবাদী পক্ষদ্বয়ের অর্থে প্রচুর অর্থের সংস্থান করিয়া লইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বর্ষেরও উর্দ্ধকাল মোকদ্দমা চলায়, হরিশ্চন্দ্র প্রবল ঋণগ্রস্ত হইলেন এবং নিম্ন আদালতে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াও কলিকাতা হাইকোর্টের শেষ বিচারে পরাজিত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র কপর্দ্দকশূন্য; তাঁহার ঋণের পরিমাণ এত অধিক দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহার দ্বারা

তাহা পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে মহাজনেরা হরিশ্চন্দ্রের অবশিষ্ট সম্পত্তি আদালতের সাহায্যে নিলাম করিয়া লইলেন। লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, অবশেষে হরিশ্চন্দ্রের বাসগৃহ এবং বাস্তুভূমি পর্য্যন্ত নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল, তিনি সম্পত্তিহীন, গৃহশূন্য ও হতমান হইয়া জন্মভূমির নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্বশুরগৃহে অবস্থিতি করিয়া অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে জীবন্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। ১৩০৬ সালে হরিশ্চন্দ্র গতাসু হইয়াছেন, কিন্তু আজও এই শোচনীয় ঘটনার জ্বালাময়ী স্মৃতি লোকের অন্তঃকরণে নবভাবে জাগরূক রহিয়াছে!

সালবাদ্রা রাজা মেহেরচন্দ্রের নিকট স্ক্র্যাপ্‌স্রুড্‌ সাহেব ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন এবং এক্ষণে এই মহল মিশনের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। স্ক্র্যাপ্‌স্রুড্‌ সাহেব উদ্যমশীল কর্ম্মী ছিলেন, তাঁহার অদম্য চেষ্টা-যত্নে বেণাগড়িয়া মিশনের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। স্ক্র্যাপ্‌স্রুড্‌ আঠারটী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, সংস্কৃত ও বঙ্গভাষাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু সাঁওতাল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার যত্নে সাঁওতালেরা অনেকেই শিক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বহু সাঁওতাল সূত্রধর, রাজ-মিস্ত্রি প্রভৃতির কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দভাবে

জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইয়াছে। রাজপুরুষেরা স্ক্যাপ্‌স্ক্রুড্ সাহেবকে বিশেষ সমাদরের চক্ষে দেখিতেন, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত তখন বেণাগড়িয়া মিশনে শুভাগমন করিতেন। স্ক্যাপ্‌স্ক্রুড্ মলুটী এষ্টেটের অন্যতম অংশীদার; জমিদারগণের নানা আপদ-বিপদে ও বৈষয়িক অনর্থপাতে তিনি বিশেষ সহায়তা করিতেন। নানাস্থানে, প্রত্যাখ্যাত হইয়া মলুটীর জমিদারগণের মধ্যে আশ্রয় পাওয়া হেতু এবং এই আশ্রয়স্থানই তাঁহার অপরিসীম উন্নতির মূলীভূত কারণ বলিয়া, স্ক্যাপ্‌স্ক্রুড্ সাহেব মলুটীর জমিদারগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং মুক্তকণ্ঠে তাহা ব্যক্ত করিয়া ধন্যবাদ-প্রদানে সঙ্কুচিত হইতেন না। বনভূমি বেণাগড়িয়া স্ক্যাপ্‌স্ক্রুডের চেষ্টা-যত্নে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্ক্যাপ্‌স্ক্রুড্ সাহেব মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

স্ক্যাপ্‌স্ক্রুড্ সাহেবের মৃত্যুর পর মিষ্টার পি, ও, বডিং সাহেব মিশনের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। বডিং সাহেব ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি, জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ নাই, ইংরাজজাতির পাদরি সাহেবেরা যে সমুদায় গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকেন, বডিং সাহেব সেই সমুদায় সদ্‌গুণে ভূষিত। তিনি সাধারণের হিতানুষ্ঠানে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন। সম্প্রতি বডিং সাহেব

বেণাগড়িয়ায় এক সুবৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, একজন অভিজ্ঞ ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে এই চিকিৎসালয় পরিচালিত হয়। দরিদ্র ব্যক্তিরা বিনামূল্যে ঔষধ পাইয়া থাকে। এই মহদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশবাসীকে বডিং সাহেব অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। মলুটী এষ্টেটের জমিদারী-সংক্রান্ত সাধারণ কার্য্যে বডিং সাহেব উদারতাসহকারে জমিদারদিগকে যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম মলুটীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিরমুদ্রিত রহিবে।

বাবু সীতানাথ দাস ঐ স্থানের পাদরী সাহেবদিগের অন্যতম প্রধান বাঙ্গালী কর্ম্মচারী। প্রথম যৌবনে সীতানাথ স্ক্র্যাপ্‌স্ক্রুড্‌ সাহেবের নিকট সামান্য সূত্রধরের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। স্ক্যাপ্‌স্ক্রুড্‌ সাহেব সীতানাথ বাবুকে যখন যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই সীতানাথ অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ক্রমে সীতানাথ বাবু সাহেবের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়েন। বডিং সাহেবও সীতানাথ বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বপ্রকার গুরু কার্য্যের ভার তাঁহার উপরই অর্পণ করেন। সীতানাথ বাবু অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে এক্ষণে বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে শ্রীভগবান্‌ যেমন অর্থ-সামর্থ্য

দিয়াছেন, তিনি তাহার তেমনই সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। নানা সৎকার্য্যে সীতানাথ বাবু প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া এদেশে যশস্বী হইয়াছেন। মলুটী এষ্টেটের নিরাপদ হওয়া বিষয়ে সীতানাথ বাবু নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম আমরা রাজপরিবারের ইতিহাসে কৃতজ্ঞতা-সহকারে সংযোজিত করিলাম।

পৃথ্বীচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লালচন্দ্রের বংশে পুত্রাদিক্রমে এক্ষণে বাবু উমেশচন্দ্র রায় পুত্র-পরিবারবেষ্টিত হইয়া জীবিত রহিয়াছেন। মূল পরিবারের জীবিত বংশধরগণের মধ্যে উমেশচন্দ্রের সাংসারিক অবস্থা ভাল। উমেশচন্দ্র সদাচারী, নিরহঙ্কার, পূজা-পার্ব্বণে তাঁহার ভক্তি অপরিসীম; ব্রাহ্মণবিদায়ের কার্য্যে তিনি সমধিক আগ্রহান্বিত। বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে উমেশচন্দ্র সমধিক ভক্তিসহকারে প্রতি বৎসর স্বগৃহে পরিচর্য্যা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। তিনি নিজে সুব্রাহ্মণ—পরন্তু ব্রাহ্মণসেবক এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংরক্ষক।

রামচন্দ্রের বংশধরগণের মধ্যে ৺মানদাপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র ৺রামশরণ রায় নানা সদ্‌গুণে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন। রামশরণের বিনয়নম্র মধুরভাবে সকলে মুগ্ধ হইত। রামশরণ বংশের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, গত ১৩১৬ সালে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে রামশরণ

আত্মীয়-স্বজনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোক-প্রয়াণ করিয়াছেন। ৺মানদাপ্রসাদের দ্বিতীয় সহোদর বাবু তিনকড়ি রায়ও ঈশ্বরপরায়ণ পূজ-আহ্নিক-নিরত সদাচারী পুরুষ।

হরচন্দ্রের বংশে বাবু তারাপ্রসন্ন রায় জন্মগ্রহণ করিয়া বংশগৌরব মহিমামণ্ডিত করিয়াছিলেন। তিনি বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমায় মোক্তারী ব্যবসায়ে ব্যাপৃত রহিয়া অমায়িকস্বভাবে সহকর্ম্মিগণের শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, মহকুমার সকল হাকিমই তাঁহার আদর্শচরিত্রে তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। গ্রামবাসী সকলেই তারাপ্রসন্নকে অকপট শ্রদ্ধা করিত। অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইলেও তারাপ্রসন্ন কখনও কাহাকে কটূক্তি প্রয়োগ করেন নাই। সন ১৩২৬ সালে কাল বিসূচিকারোগে তারাপ্রসন্ন মলুটী অন্ধকার করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন।

দৌহিত্রগণের মধ্যে বাবু ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ননীগোপাল সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ ও ন্যায়নিষ্ঠ। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা ননীগোপালকে বালবাসে। অমায়িকস্বভাবে ননীগোপাল সমগ্র গ্রামবাসীর বিশেষ সহানুভূতি ও স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছেন। দীন-দুঃখী অনাথ-অসহায়ের উপর ননী-গোপালের আন্তরিক সহানুভূতি যথেষ্ট ও দয়া আছে।

ননীগোপালের প্রভূত দাতৃত্বও আছে। বহু দুঃস্থ ব্যক্তি তাঁহার নিকট নানাপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ ননীগোপালকে দীর্ঘায়ু ও রাজশ্রীসম্পন্ন করুন।

দৌহিত্রবংশে বাবু রমণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন কৃতী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রমণচন্দ্র কর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি সামান্য সম্পত্তি হইতে কঠোর পরিশ্রমে ও অসাধারণ প্রতিভাবলে পৈত্রিক সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। রমণচন্দ্রের পরোপকারপ্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল, তিনি বহু বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণভোজনে তাঁহার অপরিসীম অনুরাগ ছিল। সামান্য কোন ক্রিয়া উপলক্ষে তিনি বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয়ে নিজগৃহে ৺গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া সেবার সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মধ্যাহ্নজীবনে কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। গত ১৩১৬ সালে রমণচন্দ্র আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক ৺কাশীধামে বীরের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন। রমণচন্দ্রের তিনটী পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ তমোরীশ চট্টোপাধ্যায় উদ্যমশীল কৃতী যুবক। তমোরীশ সরলচিত্ত, পরোপকারী এবং পিতার ন্যায় কর্ম্মশীল। তমোরীশের অক্লান্ত চেষ্টায় ও অদম্য উৎসাহ-যত্নে তাঁহার বৈষয়িক ও আর্থিক বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

গ্রামের মান্য-গণ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ৺নিশানাথ চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং নানা সদ্‌গুণে গ্রামবাসীর শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। নিশানাথের দুই পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম্‌-এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ হিতজনক কার্য্যে নিশানাথের বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতি ছিল। গভীর দুঃখের বিষয়, ১৩২৮ সালে নিশানাথ পরলোক গমন করিয়া গ্রামবাসীকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছন।

বাবু হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মলুটী গ্রামের উচ্চশিক্ষিত-গণের শীর্ষস্থানীয়। তিনি সংস্কৃতভাষায় প্রশংসার সহিত এম্‌-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কৃষ্ণনগর গবর্ণমেণ্ট কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্যে ব্রতী আছেন। হরিলালের সহিত যিনি আলাপ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বিনয়ে ও উদারতায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন। হরিলাল বহু সদ্‌গুণের আধার এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রীতিমান্‌। সংস্কৃত হইতে অনেক রত্ন চয়ন করিয়া ইনি বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ইদানীং হরিলালের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালার বিখ্যাত কবিকুলের অন্যতম যশস্বী কবি বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাল্যজীবন মলুটীতে অতিবাহিত

করিয়াছিলেন। এই স্থানের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেই তাঁহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয়। নবীনচন্দ্র "ভুবনমোহিনী প্রতিভা", "আর্য্য-সঙ্গীত", "সিন্ধুদূত" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি প্রদান করিয়াছেন। এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যের মহারথিগণ নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলীকে উচ্চাসনে স্থান দিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কবিতাপাঠে দেহ কণ্টকিত হয়; জ্বালাময়ী ভাষায় নির্জীব প্রাণ সজীবতা লাভ করে—ভাবের উচ্ছ্বাসে হৃদয় আনন্দে বিভোর হইয়া উঠে। পল্লীর শান্ত-স্নিগ্ধ নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া তিনি যে অমৃতের অফুরন্ত ধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা পান করিয়া বাঙ্গালী পাঠক ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। নবীনচন্দ্র মহাভাগ্যবান্ পুরুষ, এদেশের বাণীর সেবকেরা কমলার নিগ্রহ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি অলৌকিক প্রতিভাবলে ও কর্ম্মশক্তিতে কমলারও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র শিশুর ন্যায় সরল, সদাই প্রসন্নচিত্ত এবং অকপট ভগবদ্‌বিশ্বাসী। নবীনচন্দ্রের পুণ্যফল তাঁহার কৃতী পুত্রগণে প্রতিফলিত হইয়াছে। এক পুত্র পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং অপর দুই পুত্র উকীল।

মলুটীর আর একজন সদাত্মাপুরুষের অনন্ত সদ্‌গুণের কাহিনী এই পুস্তকে সংযোজিত না হইলে ইহা অপূর্ণ রহিয়া

যায়। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির নাম বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ইনিও রাজবংশীয়গণের দৌহিত্র। যোগীন্দ্র-নারায়ণ সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের আধার। এমন নিষ্কলঙ্ক পূতচরিত্রের মহামনা ব্যক্তি এ যুগে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সত্য-বাদিতা কি মহামূল্য কৌস্তুভমণি, যোগীন্দ্রনারায়ণই তাহা জীবনে অনুভব করিয়াছেন। যোগীন্দ্রনারায়ণ জীবনে কখনও মিথ্যা ব্যবহার করেন নাই। সত্যরক্ষার জন্য তিনি কত সময়ে কতপ্রকারে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাপি তিনি জন্মান্তরের সাধনালব্ধ সনাতন ঋতমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। সমগ্র গ্রামবাসী জীবন দিয়া যোগীন্দ্রনারায়ণকে বিশ্বাস করে। বিপন্নের বিপদুদ্ধারে, দুঃস্থের অভাবমোচনে, আর্ত্তের সেবায় যোগীন্দ্রনারায়ণ আত্মহারা, গ্রামের হিতানুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী, পরার্থে তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গীকৃত। যোগীন্দ্র-নারায়ণ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুপুরুষ, পূজা-আহ্নিক ব্যতীত তিনি জলস্পর্শ করেন না; সৎচর্চ্চায় তিনি সমধিক আনন্দ লাভ করেন, ভগবৎ-গুণানুকীর্ত্তনে তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু দেখিলে পাষণ্ডের প্রাণও গলিয়া যায়। ভগবান এই ঋষিকল্প পুরুষ-প্রবরকে দীর্ঘজীবী করুন। যোগীন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। রাধাশ্যাম উন্নতমনা চরিত্রবান্ যুবক। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পিতৃগুণে ভূষিত করুন।

রাজবংশের সম্পত্তিসমূহ রাজা আনন্দচন্দ্রের সময়ে জরীপ-জমাবন্দী হইয়া সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। তৎপরে দীর্ঘকাল এ বিষয়ে আর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট না হওয়ায়, মধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল যে, অংশীদারগণের মধ্যে পরস্পরের অধিকার ও সীমানা-সরহদ্দের স্বত্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ব্বদাই মনোমালিন্য ও মামলা-মোমদ্দমা উপস্থিত হইত। এইরূপ সময়ে ১৯১২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের কৃপায় মলুটী এ ষ্টেটের বীরভূম জেলাস্থিত সম্পত্তিসমূহের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জরীপ জমাবন্দী আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত পি, এম্, রবার্টসন নামক জনৈক সহৃদয় ইংরাজ সেটেলমেণ্ট অফিসার হইয়া আইসেন। রবার্টসন সাহেব সুশিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি, ভগবানের দয়ায় রাজবংশীয়েরা এইরূপ উদারহৃদয় রাজপুরুষকে সেটেলমেণ্ট অফিসার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহলের প্রজারা অংশীদার-বহুল ভূস্বামিগণকে গ্রাহ্য করিত না। একজনের কাছে বাসনানুরূপ কার্য্য না হইলে অন্যের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিত। তাহাদিগকে বাধ্য করিবার উপযুক্তরূপ কাগজপত্র কাহারও নিকট ছিল না। গোপনভাবে তাহারা কত জমি-জমা বিনাকরে ভোগ-দখল করিত। প্রজাদিগের অনুগ্রহের উপর খাজনা আদায় হইত। বাকী খাজনার অভিযোগ উপস্থিত হইলে প্রজারা এমনভাবে প্রতিকূল জবাব দাখিল করিত যে, খাজনার টাকা ডিগ্রি করা কঠিন হইত। এইরূপ

নানা কারণে ক্ষুদ্র অংশীদারগণের সম্পত্তি ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। জমিদারগণের এইরূপ দুর্দ্দিনে রবার্টসন আসিয়া অপরিসীম কঠোর পরিশ্রমে সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা অপসারিত করিলেন, রাজা প্রজার বিরোধ নিরপেক্ষ বিচারে সুমীমাংসা করিয়া দিলেন, সীমানা-সংক্রান্ত গোলযোগ নিরাকৃত করিলেন এবং অতি সুন্দর গোলযোগশূন্য কাগজাদি প্রস্তুত করিয়া দিলেন। প্রজারা অন্যায়ভাবে যে সকল জমি-জমা ভোগ করিয়া আসিতেছিল, রবার্টসনের কৃপায় তাহার উদ্ধার সাধন হইল। জমিদারগণকে তিনি অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, একজন ক্ষুদ্র জমিদারের উপরও তাঁহার সমদৃষ্টি ছিল। ন্যায়পথে জমিদারগণের যতদূর সুবিধা ঘটিতে পারে, প্রাণপাতযত্নে তাহা রবার্টসন সাহেব করিয়া দিয়াছেন। জমিদারগণের সম্পত্তির আয়ও দেড়গুণের অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। রবার্টসনের নিকট জমিদারেরা অপরিশোধ্য ঋণে চির-আবদ্ধ। তাঁহার মধুময় স্মৃতি জমিদারগণের মানসক্ষেত্রে চির জাগরূক রহিবে।

দশ বার বৎসর পূর্ব্বে মলুটীতে সুখদানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সংসারবিরাগী সাধুর শুভাগমন হয়। গ্রাম্য দেবালয়সমূহের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি সেই সকলের সংস্কার-মানসে মলুটীতেই থাকিয়া যান। সুখদানন্দের ন্যায় নির্লোভ, স্বার্থত্যাগী, কর্ম্মবীর এ যুগে কমই

দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি জনসাধারণের নিকট চাঁদা ও সাহায্য সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন শিবমন্দির সমূহের ভগ্ন অংশ সমূহ সংস্কৃত করিলেন, গ্রাম্য কুলদেবতা মৌলিক্ষা দেবীর সুবৃহৎ অঙ্গন ইষ্টক-প্রাচীর-সুশোভিত করিলেন, পরে সীমাবদ্ধ বাড়ীর মধ্যে পরম মনোরম বিবিধ সুরভিপুষ্পের বাগান প্রস্তুত করিলেন। মলুটীর ছয় মাইল দূরে ই, আই, রেলওয়ের মল্লারপুর ষ্টেশন অবস্থিত। মলুটী হইতে মল্লারপুর পর্য্যন্ত গমনাগমনের সুগম পথ ছিল না, বর্ষাকালে যাতায়াত এক প্রকার দুঃসাধ্য ছিল, লোকের ক্লেশের সীমা রহিত না। সুখদানন্দ এই উভয় স্থানের মধ্যে সাধারণের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতে হস্তক্ষেপ করিলেন। সৎকার্য্যে ভগবান্ অলক্ষে থাকিয়া সহায়তা করেন, জমিদারগণ রাস্তার জন্য গৃহীত জমীর মূল্য গ্রহণ করিলেন না, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুখদানন্দের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া রাস্তা প্রস্তুতকরণে তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিলেন। সুখদানন্দের প্রাণপাতযত্নে মলুটী হইতে মল্লারপুর পর্য্যন্ত সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হইল। সুখদানন্দ মলুটীর ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসিগণের অকপট শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন সাধারণের সেবায় উৎসর্গ করিয়া এই প্রদেশেই তিনি ১৩২৪ সালে

দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার শত শত অনুষ্ঠিত হিতানুষ্ঠান তাঁহাকে এ অঞ্চলে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

গ্রামে গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত একটী মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় আছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট এই মাইনর স্কুলে মাসিক ৭৫৲ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিয়া স্কুলটী সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইবার পরম সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। এই পুস্তকলেখক বিদ্যালয়ের সম্পাদক। লোকশিক্ষার অনুকূল একটী সার্ব্বজনীন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সংকল্প কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছে। পল্লীতে কোন দাতব্য চিকিৎসালয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই, বাবু ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায় রাজপরিবারের গৃহ-চিকিৎসক। ভূপতিনাথ চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ।

মলুটী ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। ব্রাহ্মণোচিত সদাচার পালন রাজবংশীয়দের কুলপ্রথা। অধুনা সকলেই প্রায় ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও সনাতনধর্ম্মানুমোদিত আচারপালনে কেহই পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু বর্ত্তমানে উচ্চশিক্ষার ব্যয় দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে কেবলমাত্র স্বচ্ছল গৃহস্থ ব্যতীত স্থানান্তরে ছেলেদের পাঠাইয়া শিক্ষাদানের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করা অল্পবিত্তের পক্ষে কষ্টকর, সন্দেহ নাই। এই হেতু ব্রাহ্মণসন্তানদের জন্য গ্রামে একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির অধ্যয়ন অধ্যাপনা হইতে থাকার একান্ত

প্রয়োজন হইয়াছে। এই উপলক্ষে একজন অধ্যাপকের যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তির ব্যবস্থা হইলেই অন্য অসুবিধা থাকে না। পূজা-পার্ব্বণ ও শ্রাদ্ধাদিতে সদ্‌গৃহস্থগণ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের পূজা করা স্ব স্ব কর্ত্তব্যমধ্যেই গণনা করেন। গবর্ণমেণ্টও প্রাচীন শিক্ষায় অনেক অর্থ দিয়া থাকেন। এ ছাড়া দেশের অনেক বড়লোক এই সৎকার্য্যে অর্থ দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে সমুৎসুক। আমার বিশ্বাস, যে বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের অধ্যাপনার সাহচর্য্যে অকাতরে অর্থ ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কৃতী বংশধরেরা আমার এই কথার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া গ্রামে একটি চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইবেন।

রাজবংশের দৌহিত্রগণের মধ্যে শ্রীমান্ জয়সিন্ধু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে ব্রতী আছেন, শ্রীমান্ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সব্‌ওভারসিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বাবু তারকেশ্বর রায়, বাবু সুকুমার রায়, বাবু করুণাসিন্ধু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী উন্নতিশীল যুবক উদ্যম-অধ্যবসায়গুণে অপেক্ষাকৃত সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছেন।

উপসংহার

পুণ্য-শ্লোক গৃহ-যোগী রাখড়চন্দ্রের পূত রক্তকণিকায় যাঁহাদের উৎপত্তি, ভগবদ্ভক্ত সাধু আনন্দচন্দ্রের যাঁহারা ভবিষ্য বংশধর, বিধাতার কোন্ বিধানে সেই মহনীয় বংশ অল্পকালের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, সে কথার গূঢ় রহস্য কিছুমাত্র বুঝিতে পারি না। আনন্দচন্দ্র, জগচ্চন্দ্র ও গঙ্গাগোবিন্দ নামক দুই কুল-প্রদীপ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জগচ্চন্দ্র হইতে পর পর মোহনচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও মেহেরচন্দ্র পর্য্যন্ত রাজা উপাধির ব্যবহার ও সম্পত্তির ভোগদখল বজায় ছিল। ঈশানচন্দ্রের শেষজীবনে চঞ্চলা কমলা হতভাগ্য রাজ-পরিবারকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন, তদীয় পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্রের সময়ে তাঁহার নিগ্রহ চরমে উঠে। এক্ষণে কীর্ত্তিচন্দ্র নিঃসন্তান-অবস্থায় পরলোকে। আনন্দচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র গঙ্গাগোবিন্দের ফতেচন্দ্র, ফকিরচন্দ্র ও গণেশচন্দ্র নামক তিন পুত্রের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র বংশের উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা তিন জনেই দীর্ঘজীবী হইয়া গতাসু হইলেও বিধাতার বিচিত্র বিধানে কেহই বংশরক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদের বিষয়-

সম্পত্তি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ঘটনা পরম্পরায় নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোকের উপভোগে আসিয়াছে। উক্ত পরিবারের দুই চারি জন এখনও যাঁহারা জীবিতাবস্থায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের দুঃখ-দৈন্যের হৃদয়-বিদারক কাহিনী বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া পাঠকগণকে আর অধিকতর ব্যথিত করিতে ইচ্ছা করি না।

প্রাচীনকাল হইতে এই বংশীয়গণ বিলাস-বাসনা-বর্জ্জিত। অবস্থাপন্ন লোকেরাও মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে বাস করিতেন। চিরদিন এখানে ধনের পরিচয় ছিল—পূজা-পার্ব্বণে, ক্রিয়া-কর্ম্মে ও দান-ধ্যানে। হিন্দুর পবিত্র ভাব, শিক্ষা দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা এখানকার সমাজে ওতঃপ্রোতঃভাবে বিরাজিত ছিল। কাহারও কিছু সঞ্চয় হইলে, তাহা বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হইত না, এইজন্যই বহুসংখ্যক শিবমন্দির এই পল্লীখানিকে বারাণসী তুল্য করিয়া রাখিয়াছে। এক ক্ষুদ্র পল্লীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক পুষ্করিণী আছে। এই বিংশ শতাব্দীর স্বেচ্ছাচারিতার দিনে আজও এখানে জাতিগত বিশিষ্টতা অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রহিয়াছে, আজও গৃহে গৃহে বার মাসে তের পার্ব্বণ, পূজাপাঠ, কীর্ত্তন-পদ্ধতির সমাদর বর্ত্তমান আছে। জাতীয় মর্য্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে এখানকার লোকেরা এখনও পদস্খলিত হয়েন নাই। পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আজ পর্য্যন্ত প্রাচীন আদর্শের প্রভাব বিস্মৃত

হয়েন নাই। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা সর্ব্বপ্রকার গৃহকার্য্য করিতে, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া স্বামী, পুত্র এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা করিতে আলস্য বোধ বা অপমান জ্ঞান করেন না।

এই পুণ্যপূত প্রাচীন পরিবার অভ্যুত্থানের দিন হইতে এ কাল পর্য্যন্ত মানবতার পূর্ণ আদর্শ হইতে এক দিনের জন্যও বিচলিত বা স্খলিতপদ হয়েন নাই, আবহমানকাল যে মহনীয় বংশ আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়া, পরার্থে স্বীয় ধনরত্ন উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন, যাঁহাদের প্রদত্ত নিষ্কর ভূমির উৎপন্ন শস্যে কত পরিবার সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শত শত সদনুষ্ঠানে সহস্র সহস্র লোকের দারিদ্র্যক্লেশ অপনীত করিয়াছেন, জানি না, কোন্ দেবতার অভিসম্পাতে তাঁহাদের বংশাবলীর সৌভাগ্য-সূর্য্য আজ অস্তমিত হইতে বসিয়াছে! বর্ত্তমান সময়ে রাজপরিবারের কয়েকজনমাত্রের সাংসারিক অবস্থা, বৈষয়িক আয় ও অর্থ-সামর্থ্য অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কিন্তু অধিকসংখ্যক পরিবারের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। একদিন যাহারা সর্ব্ববিধ সুখের ক্রোড়ে, সোহাগে আদরে লালিত পালিত হইয়াছে, যাহাদের সন্তুষ্টিসাধন ও আদেশ পালনহেতু দাসদাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিত, ক্ষীর সর নবনীত যাহাদের নিকট একদিন উপেক্ষিত হইত,

হায়! হায়! লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, আজ তাহাদের বংশাবলীর অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন, অনেকেই গ্রাসাচ্ছাদনের ও মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য লালায়িত। অনেক অবিবেকী অমিতব্যয়ী ব্যক্তি বুঝিবার, চলিবার দোষে প্রবল ঋণগ্রস্ত হইয়া অকালে পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদের অবিমৃষ্যকারিতার শোচনীয় পরিণাম হতভাগ্য বংশধরগণকে এক্ষণে সহস্র বৃশ্চিক দংশনের তীব্র যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত করিতেছে। অনেক ঋণ-বিপন্ন স্বামীর অকালবিয়োগে তদীয় বিধবা অনাথ নাবালক শিশুগণের ভরণপোষণের দুশ্চিন্তায় অস্থিকঙ্কালসার দেহ লইয়া দিবসরজনী হাহাকার ও হতাশপ্রাণের তপ্ত অশ্রুতে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিতেছেন। অনেক হৃদয়হীন নিষ্ঠুর মহাজন ঋণদায়ে অনেকের যথাসর্ব্বস্ব নীলামের মুখে সুলভ-মূল্যে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ফলে হৃতসর্ব্বস্বরা যে মর্ম্মন্তুদ দৈন্য-ক্লেশ ভোগ করিতেছে, তাহা লিখিতে হস্ত কম্পিত হয়, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হয়। কর্ম্মফলে মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হয়; পিতৃপিতামহের পুণ্য পুত্র পৌত্রে সংক্রামিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক এবং শাস্ত্রের বচন। কোন্ দৈব শক্তির প্রেরণায় সেই পূতপুণ্যের পুরস্কার এই ভাবে ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, তাহা শ্রীভগবান্‌ই জানেন। চঞ্চলা কমলা চিরদিন একস্থানে আবদ্ধা রহেন না, তাই বুঝি তিনি ধীরে ধীরে

রাজবংশের সংশ্রব ছিন্ন করিতেছেন। অনেক কুবেরতুল্য ধনশালী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত বিপন্নগণের সম্পত্তি দিনে দিনে ক্রয় করিতেছেন। তাঁহাদের শক্তিসম্পন্ন প্রভাব কালসহকারে হয় ত করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবশিষ্ট স্বচ্ছন্দপর নিরীহ-গণের কোন্ ক্ষণে সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, এই ভীষণ ভবিষ্য বিপদ্‌রাশির কথা মনে ভাবিয়া প্রাণ আতঙ্কিত ও আকুলিত হয়! সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ রাজপরিবারকে রক্ষা করুন।

সমাপ্ত

———

বংশ-তালিকা

শিকির তরফ।
রাজা জয়চন্দ্র
দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্র
রুদ্রনারায়ণ
পঞ্চানন
কমলচন্দ্র
রাজকিশোর
হরিশ্চন্দ্র
মানদাপ্রসাদ
তিনকড়ি
রামরঞ্জন
রামতারণ
রামশরণ

বংশ-তালিকা

মধ্যম তরফ।

বংশ-তালিকা
ছয় তরফ।
রাজা জয়চন্দ্র
তৃতীয় পুত্র মহাদেব
সভাচন্দ্র
গোকুলচন্দ্র
মাণিকচন্দ্র
সুখচন্দ্র
হীরাচন্দ্র
রাজারাম
ঠাকুরচন্দ্র
দেবদত্ত
হরচন্দ্র
মদনচন্দ্র
কৈলাশনাথ
গোপালচন্দ্র
দর্পনারায়ণ
শিবরাম
মহেশ
মৃত্যুঞ্জয়
নবীনচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
মানগোবিন্দ
ধনগোবিন্দ অকিন অনুকূল
দৌহিত্র রজনী সমরেন্দ্র
শ্রীচন্দ্র
তারাপ্রসন্ন
পৌত্র সত্যগোপাল ও পুত্র
বিধু, শশধর, অবনী, যতীন্দ্র,
ও নীরজাক্ষ
তারকেশ্বর
অমরেন্দ্র ও বীরেন্দ্র
মাধবচন্দ্র
দৌহিত্র বলহরি
অশ্বিনী, শ্রীপতি
অবনীশ ও নব
রামলাল
মানদা
অটল
নিঃসন্তান
রমণ
ভুজঙ্গ
শম্ভু ও শিব
গিরিজা।
পরেশনাথ
মহানন্দ
গৌরীশঙ্কর
রাজবল্লভ
নিঃসন্তান
অমীরচন্দ্র
সিতিকণ্ঠ
দৌহিত্র ক্রমে
ভবতারণ দীনতারণ
মতিলাল
কালীপ্রসন্ন
নীলমণি
ফুলচাঁদ
প্রসন্নকুমার
আশুতোষ
হৃষিকেশ
প্রফুল্ল, অনিল
ও প্রবোধ
মার্কণ্ডেয়
মনোমোহন
সুকুমার
দৌহিত্র জগদিন্দু খগেন্দু
ও সৌরীন্দ্র